ওঁ

অধ্যাত্ম বিদ্যা

শ্রীশ্রী১০৮ শ্রীমৎস্বামী মহাদেবানন্দ গিরি
মণ্ডলেশ্বর মহারাজ-প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

বরিশাল, বগুড়া রোড, ভোলানন্দসন্ন্যাসাশ্রম হইতে
স্বামী বৈদ্যনাথানন্দ গিরি
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩৪৭।

মূল্য আট আনা।

উৎসর্গ ঃ

পরমারাধ্যতম গুরুদেব

শ্রী১০৮ শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য

স্বামী ভোলানন্দ গিরি

মহারাজের শ্রীচরণ কমলে।

হরদ্বার,

শিব চতুর্দ্দশী ১৩৩৩।

মহাদেবানন্দ ঃ

সূচী।

প্রথম বল্লী।

দ্বিতীয় বল্লী।

তৃতীয় বল্লী।

চতুর্থ বল্লী।

পঞ্চম বল্লী।

ষষ্ঠ বল্লী।

সপ্তম বল্লী।

অষ্টম বল্লী।

নবম বল্লী।

দশম বল্লী।

একাদশ বল্লী।

দ্বাদশ বল্লী।

ত্রয়োদশ বল্লী।

ওঁ

শ্রীগুরবে নমঃ

অধ্যাত্ম বিদ্যা।

প্রস্তাবনা।

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞান মূর্ত্তিং
দ্বন্দাতীতং গগন সদৃশং তত্ত্বমস্যাদি লক্ষ্যং।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বধী সাক্ষী ভূতং
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি॥

দেড় শত বৎসর যাবত ভারতে পাশ্চাত্য ভাষার বহুল প্রচারে সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা বড়ই কম। সংস্কৃত অধ্যাত্ম বিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থের অভাব নাই, কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষা ও আচার ব্যবহার সমধিক পরিমাণে প্রচলিত হওয়ায় যুবকদিগের সংস্কৃত হইতে অধ্যাত্ম বিদ্যা শিক্ষা করিবার মতি গতি এবং অবসর হইয়া উঠে না। দেশের গৃহস্থগণের আর্থিক অবস্থা ও নানা কারণে সুবিধাজনক না থাকায় শিক্ষা কালান্তে বিষয়-কার্য্যে সময় এত অধিক ব্যয়িত হয় যে, তৎকালেও সংস্কৃত চর্চ্চা করিবার সুযোগ প্রায়ই ঘটিয়া উঠে না। বঙ্গভাষায় সরল, সুপাঠ্য, ধর্ম্মগ্রন্থের

প্রচার ও যথেষ্ট নহে। বিশেষতঃ অর্থকরী বিদ্যা ও ব্যবহারে পারমার্থিক চিন্তা আদৌ প্রবেশ করিতে পারে না। ইদানীং ভগবৎ কৃপায় বঙ্গদেশে পরমহংসপাদ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও গোস্বামীপাদ বিজয়কৃষ্ণ জন্ম গ্রহণ করিয়া, বাংলার কেন, জগতের শিক্ষার হাওয়া বদলাইয়া দিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের সাধন-কাল যতই দীর্ঘ হউক না, প্রচারের কাল সংক্ষিপ্ত। পরমহংসদেব ১২৮৮ হইতে ১২৯৩ এবং গোস্বামী পাদ ১২৩৮ হইতে ১৩০৬ সন মধ্যে আত্ম প্রকট করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন। তৎপরবর্ত্তী স্বামী বিবেকানন্দজীরও প্রচারের জীবন সংক্ষিপ্ত।

হরদ্বার লালতারাবাগ আশ্রমে শ্রীশ্রী১০৮ শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজ বঙ্গদেশে সাত্ত্বিকতার বিকাশার্থ বহু শিষ্য করিয়াছেন। লেখক তন্মধ্যে একজন। দ্বাদশোর্দ্ধ বর্ষকাল গুরুর আশ্রমে থাকিয়া তদুক্ত অমৃত নিস্যন্দিনী বাক্যাবলী যাহা শ্রবণ করিয়াছি তাহারই কিয়দংশ এই ক্ষুদ্র পুস্তকে প্রকাশের প্রয়াস করিলাম। এতদ্বারা কাহারও কোন উপকার দর্শিলেই যত্ন সফল মনে করিব।

হরদ্বার,
শিব চতুর্দ্দশী,—১৩৩৩। } স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি।

ওঁ

অধ্যাত্ম-বিদ্যা

প্রথম বল্লী।

(অধ্যাত্ম বিদ্যা।)

আত্মাকে অধিকৃত কবিযা অর্থাৎ আশ্রয় করিয়া যে বিদ্যা তাহাকে অধ্যাত্ম বিদ্যা বা বেদান্ত বলে। গীতার ১০ম অধ্যায়ে ভগবান্ "অধ্যাত্ম বিদ্যা বিদ্যানাম" (১০।৩২) বলিয়া ইহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। আবার ত্রযোদশ অধ্যায়ে অধ্যাত্ম জ্ঞান বা বিদ্যা জ্ঞান সংজ্ঞাভুক্ত হইয়াছে। এই বিদ্যার লক্ষ্য আত্মা বা সৎচিদানন্দ ব্রহ্ম যাঁহাকে জানিলে আর কিছু জানিতে বাকি থাকে না।

"এতজ্ জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্ম সংস্থম্।
নাতঃপরং বেদিতব্যম্ হি কিঞ্চিৎ ॥" শ্বেতাশ্বেতর ১।১২

ইহা জানিবার বিষয়, ইনি নিত্য, প্রতিঘটে আত্মারূপে স্থিত ইহার পর আর কিছু জানিবার নাই।

"যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতম্।
মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি ॥" ছান্দোগ্য ৬।৩।

"যাহা শুনিলে শ্রবণাতীতকে জানা হয়, মনের অপ্রাপ্যকে মনন করা হয়, যাহা বুদ্ধির অগোচর তাহা জ্ঞানগোচর হয়, এমন যে বস্তু তাহাই জানিবার বিষয়।

(ব্রহ্ম ও আত্মবোধ।)

একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, দৃশ্যজগৎ প্রপঞ্চাদি আকাশ-কুসুমবৎ অলীক বা ইন্দ্রজালিকের কার্য্যের ন্যায় ভিত্তিহীন; ইহাই বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয়। ইহা সদ্‌গুরু অধিগম্য ও স্বানুভব সিদ্ধ। বঙ্গদেশে অনেকে বেদান্ত পাঠ ও উহার আলোচনা করেন। তাঁহাদের যে জ্ঞান তাহা জ্ঞানসংজ্ঞকই নহে। তৎ সম্বন্ধে ভগবান শ্রীশ্রীশঙ্করাচায্য বলিযাছেন।

"পশোঃ পশুঃ কো ন করোতি ধর্ম্মম্।
প্রাধীতশাস্ত্রোঽপি ন চাত্মবোধঃ॥"

(মণিরত্নমালা ২৯ শ্লোক।)

পশুরও পশু কে? যে ধর্ম্মানুষ্ঠান করে না বা যাহাব শাস্ত্র অধ্যযন সত্ত্বেও আত্মবোধ বা অনুভূতি হয় নাই।

(সদ্‌গুরু কে?)

সদ্‌গুরু কে? তদুত্তরে শ্রুতি ও স্মৃতি বলেন ঃ—

"গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং" মুণ্ডক ১।২।১২

শ্রোত্রিয় (গুরুকুলে বাস করিযা যিনি সাঙ্গবেদ পাঠ সমাপ্ত করিয়াছেন) ও ব্রহ্মনিষ্ঠ (ব্রহ্মজ্ঞান লাভে ব্রহ্মই হইয়াছেন) এমন গুরুর নিকট সমিৎকাষ্ঠহস্তে গমন করিবে।

"তস্মাৎ গুরুম্ প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥" ভাগবত ১১।৩।২১।

অতএব একান্ত মঙ্গল জানিতে অভিলাষী (জিজ্ঞাসু), শব্দব্রহ্ম (বেদ) তত্ত্বজ্ঞ ও পরব্রহ্ম বিষয়ে অপরোক্ষানুভব সমর্থ, ক্রোধাদির অবশীভূত গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে।

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥" গীতা ৪।৩৪।

প্রণিপাত, জিজ্ঞাসা ও গুরুসেবার দ্বারা সেই তত্ত্ব জ্ঞান লাভ কর। জ্ঞানী তত্ত্বদর্শীগণ তোমাকে উপদেশ দিবেন।

তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সুদামার সঙ্গে সন্দীপন মুনির কাঠের বোঝা বহিয়া অধ্যাত্ম বিদ্যা লাভ করেন। শ্রীরামচন্দ্র বশিষ্ঠদেব হইতে যে ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ করেন তাহার ফলে যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের শিষ্যত্ব স্বীকার করায় গীতার সৃষ্টি।

"শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্"। গীতা ২।৭।

তজ্জন্য শুকদেব রাজর্ষি জনকের ও ঔদ্দালক আরুনিতনয় নচিকেতা যমরাজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই উপাখ্যান অবলম্বনে কঠোপনিষদের সৃষ্টি।

(সদ্‌গুরু মিলা দুর্ঘট।)

"মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥" (গীতা ৭।৩।)

সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কেহ সিদ্ধির জন্য যত্ন করেন, যত্নকারী সিদ্ধগণের সহস্রের মধ্যে কেহ আমাকে পরমাত্মরূপে ঠিক জানিতে পারেন। সিদ্ধ অর্থ যাঁহাদের কর্ম্ম করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি লাভ হইয়াছে। কর্ম্ম করিতে করিতে ঈশ্বরীয় রূপ দর্শনাদির দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে এবং তখন সদ্‌গুরুর আশ্রয় লইলে আত্মদর্শন অতীব সুগম হয়।

পরন্তু সদ্‌গুরুর সংখ্যা বড়ই অল্প। “কিং দুর্লভং? সদ্‌গুরুরস্তি লোকে। সৎসঙ্গতি ব্রহ্মবিচারণা চ।” (প্রশ্নোত্তরী ২৮) ইহলোকে কি দুর্লভ? সৎগুরু, সৎসঙ্গ ও ব্রহ্মবিচার। এইরূপ সৎশিষ্যও দুর্লভ। এজন্য পশ্চিমাঞ্চলে এক প্রবাদ আছে “গুরু মিলে লাখ লাখ চেলা না মিলে এক”।

প্রকৃত বৈরাগ্য উৎপন্ন হইলে পর সন্ন্যাস গ্রহণ করে এমন লোকের সংখ্যা বড়ই কম। দুঃখ শোকাদি জনিত মর্কট বৈরাগ্য হইতেই বহুব্যক্তি সন্ন্যাস লইয়া থাকে। ব্যবসা হিসাবেও অনেকে ভিক্ষুক আশ্রম অবলম্বন করিয়া থাকে।

(মনুষ্য জীবনের কৃতকৃত্যতা।)

“ন ভূতিযোগেঽপি কৃতকৃত্যতোপাস্যসিদ্ধিবদুপাস্যসিদ্ধিবৎ।”
সাংখ্য প্রবচন ৪।৩২।

যেমন উপাস্য দেবতার অর্চ্চনাদির দ্বারা দেবদর্শন লাভ হয় কিন্তু তদ্দ্বারা মনুষ্য জীবনের সার্থকতা লাভ হয় না তদ্রূপ হিরণ্যগর্ভের উপাসনা দ্বারা অণিমাদি ঐশ্বর্য্য বা বিভূতি লাভ করিলেও মনুষ্য জীবন ধন্য হয় না; কেবল আত্মদর্শনেই মনুষ্যজীবনের কৃতকৃত্যতা হইয়া থাকে।

বৃন্দাবনে (শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধে ৮২ অধ্যায়) গোপীগণ কৃষ্ণ প্রেমে একনিষ্ঠ হইয়া শুদ্ধচিত্ত হইবার বহুবর্ষ পর, কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্শনে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক আপ্যায়িত ও আলিঙ্গিত হইয়া কৃষ্ণকে সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মরূপে চিন্তন করিবার জন্য উপদিষ্ট হইয়া অতি অল্প সময়ে জ্ঞানলাভে কৃতকৃত্য হইয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীপরমহংস রামকৃষ্ণ দেবের জীবনে এইটী স্পষ্টীকৃত হয়। তিনি কালীকা দেবীর দর্শন এবং তৎসহ আলাপনাদি করিলেও উপাস্য সিদ্ধি

লাভের পর হিরণ্যগর্ভের উপাসনা ও সর্ব্বশেষে তোতাপুরী হইতে সন্ন্যাস দীক্ষা লইয়া আত্মদর্শনে কৃতকৃত্য হইয়াছিলেন।

যে পর্য্যন্ত জ্ঞান লাভে কৃতকৃত্য না হওয়া যায় তাবৎ পুনঃ পুনঃ সংসার যাতায়াতরূপ দুঃখের একান্ত নিবৃত্তি হয় না॥

'আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥"

(গীতা ৮।১৬)

ব্রহ্মলোক হইতেও (অপ্রাপ্তজ্ঞান) জীবগণ সকলেই পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে কিন্তু আমাকে (পরব্রহ্মকে) পাইলে আর পুনর্জন্ম হয় না।

দ্বিতীয় বল্লী।

—০✻০—

(সৎ শিষ্যের লক্ষণ।)

"তপোযজ্ঞদানাদিভিঃ শুদ্ধবুদ্ধি বিরক্তো নৃপাদৌ পদে তুচ্ছবুদ্ধ্যা।
পরিত্যজ্য সর্ব্বং যদাপ্নোতি তত্ত্বং..................॥

(বিজ্ঞান নৌকা)

তপস্যা (কায়িক ক্লেশাদি সহন, উপবাস, প্রায়শ্চিত্তাদি ব্রতানুষ্ঠান, যজ্ঞ (জ্ঞান, দান, জপ, যজ্ঞাদি), দান (সাত্ত্বিক বুদ্ধিতে দেশ, কাল, পাত্র ভেদে সমর্পণ) দ্বারা শুদ্ধবুদ্ধি ও বৈরাগ্য.

যুক্ত হইয়া রাজপদ প্রভৃতি তুচ্ছ মনে করতঃ সর্ব্বস্ব পরিত্যাগে যে তত্ত্ব পাওয়ার জন্য প্রস্তুত এমন শিষ্য বাস্তবিক দুর্লভ নহে কি? কঠোপনিষদে দেখিতে পাই সত্যনিষ্ঠ নচিকেতা যমরাজকে অধ্যাত্ম বিদ্যা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে যমরাজ তাহাকে বালক বলিয়া ব্রহ্মবিদ্যা দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন এবং রাজ্য, দীর্ঘায়ু ও বহু ধন রত্নাদি দিতে চাহেন। নচিকেতা তাহা লইতে স্বীকৃত হন নাই। সেইজন্য যমরাজ তাহার ত্যাগের পরাকাষ্ঠায় বিমুগ্ধ হইয়া তাহাকে অধ্যাত্ম বিদ্যা দিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ ও লালাবাবুর ত্যাগের দৃষ্টান্ত বঙ্গদেশকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। শিষ্য হইতে চাহিলেই সৎশিষ্য হওয়া যায় না। তজ্জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। নতুবা সদ্‌গুরু সাক্ষাৎকার ফলপ্রসূ হয় না। পরমহংসদেব ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজির আবির্ভাবে বাংলা ধন্য হইলেও কয়জন স্বামী বিবেকানন্দ হইয়াছেন? সৎশিষ্যের লক্ষণ শ্রুতিতে এইরূপ পাওয়া যায়।

"তস্মৈ স বিদ্বান্ উপসন্নায় সম্যক্
প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়॥
যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং
প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্॥ (মুণ্ডক ১।২।১৩)।

প্রশান্ত চিত্ত শমাদি সংযুক্ত, সমিৎপাণি শিষ্যকে, গুরু ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করিবেন।

সম্পূর্ণ ভাবে (তন্, মন্, ধন্ দিয়া) গুরু সেবা ও তদ্‌বাক্য পালন তৎপর, ইন্দ্রিয় তদ্‌বৃত্তি বশীভূত হওয়ায় প্রশান্ত চিত্ত, শম, দম, উপরম, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা, সমাধান, বিবেক, বৈরাগ্য ও মুমুক্ষত্বাদি গুণযুক্ত, বেদ বেদাঙ্গাদি পাঠে অক্ষয় পুরুষ ব্রহ্মকে সত্য বলিয়া বিশ্বাসকারী ব্যক্তিকে আচার্য্য ব্রহ্মবিদ্যা বলিবেন।

"আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" আচার্য্যবান পুরুষই ব্রহ্মকে জানিতে পারেন। আচার্য্য ভগবানেরই স্বরূপ।

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ"

(ভাগবত)।

আমাকেই আচায্য বলিয়া জানিবে।

"উপনীয় তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্বিজঃ।
সকল্পং সরহস্যঞ্চ তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে।"

মনু ২য় অধ্যায়।

যিনি শিষ্যকে উপনয়নে অভিষিক্ত করিয়া যজ্ঞের বিধিসমূহ ও গূঢ়ার্থের সহিত বেদ ও উপনিষদাদির শিক্ষা প্রদান করেন সেই ব্রহ্মবিদ্ই আচায্য।

যাঁহার মন ব্রহ্মবেত্তার চরণারবিন্দে আশ্রয় লইয়াছে তিনি ত্রিভুবনের পূজাস্পদ। সদ্গুরুর পদযুগলে সকল তীর্থের সমাবেশ জানিয়া তাঁহার চরণামৃত মস্তকে ধারণ করিলে সকল তীর্থের জলে স্নান করা হয; শ্রীগুরু চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলে দেহরূপিণী ধরা তাঁহাকে উৎসর্গীত করা হয। ইহাতে সমস্ত পৃথিবী দানের পুণ্য লাভ হয়। ব্রহ্মবিৎ মহাপুরুষের সঙ্গ লাভার্থ যত পদ হাঁটীয়া যাওয়া যায় প্রতি পদবিক্ষেপে তত কোটী অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয। এক গুরুপূজা করিলেই সকল দেবতার পূজা করা হয় "ন গুরোরধিকং" গুরুর চেয়ে বড় নাই।

সামান্য বিত্ত হইতে ব্রহ্মলোক লাভ পর্য্যন্ত কাকবিষ্ঠার ন্যায় ত্যাগ বৈরাগ্যের সীমা। শম—মনের নিগ্রহ দ্বারা বাসনার নিরাকরণ। দম—চক্ষু প্রভৃতি বাহ্য ইন্দ্রিয়গণের নিগ্রহ দ্বারা বহির্বিষয় হইতে দূরে থাকা। উপরম—স্বধর্ম্মানুষ্ঠান জন্য সর্ব্বত্যাগ বা সন্ন্যাস অর্থাৎ সুষুপ্তি অবস্থার ন্যায় জাগ্রৎ অবস্থায় বিষয় ভোগের বিস্মৃতি। তিতিক্ষা—শীতোষ্ণ, সুখ,

দুঃখ, মান, অপমান প্রভৃতির দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা। শ্রদ্ধা—গুরু বেদান্তাদি শাস্ত্র বাক্যে বিশ্বাস। সমাধান—চিত্তের একাগ্রতা। অপি চ

"তপোভিঃ ক্ষীণপাপানাং শান্তানাং বীতরাগিণাম্।
মুমুক্ষুণামপেক্ষ্যোঽয়মাত্মবোধো বিধীয়তে॥"

যাহাদের তপস্যার দ্বারা পাপ ক্ষীণ হইয়াছে, ও বিষয়াসক্তি রহিত হওয়ায় চিত্ত শান্ত হইয়াছে এমন যে মুমুক্ষু (মোক্ষ অর্থাৎ জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি সংসার দুঃখ হইতে মুক্তি পাইবার তীব্র ইচ্ছা বিশিষ্ট) তাহাদেব আত্ম বোধের অধিকার জন্মে।

তৃতীয় বল্লী।

—০*০—

(গুরু করণের প্রয়োজনীয়তা।)

অনেকে মনে করেন গুরু কবণের কোন প্রয়োজন নাই। সত্য পথে চল। কিন্তু তাহারা ভাবিয়া দেখেনা যে চাষা হইতেও গুরু লাগে। কেমন ভূমিতে কোন সময কোন ফসল হয়, কোন বীজ কি প্রণালীতে বপন করে, কোন শস্যে কি পরিমাণ কোন জাতীয় সার দেয়, এমন কি হালের মুঠি ধারণ শিখিতেও গুরু লাগে, শিল্প বিজ্ঞানের ত কথাই নাই। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপারেই যখন গুরু সাহায্য প্রয়োজন তখন ইন্দ্রিয়াতীত সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতর বিষয়ের জ্ঞান যে গুরু সাহায্য বিনা হইতেই পারে না তাহা তাহাদের হৃদয়ে আদৌ জাগে না। গুরু শব্দ প্রয়োগ না করিলেও বহুদর্শী বিজ্ঞ জনের সাহায্য সর্ব্বদা সর্ব্ব বিষয়ে

আবশ্যক। "গু" অর্থ অন্ধকার বা অজ্ঞান—"রু" অর্থ—প্রকাশ। যেমন সামান্য বিষয় হউক না কেন তদ্বিষয়ে অজ্ঞতা বা অন্ধকার নিরাকরণ-কারক যিনি তিনিই গুরু। তুমি নূতন স্থানে গেলে। রামের বাটী যাইবে। রামের বাটী সম্বন্ধে তোমার কোন জ্ঞান নাই। একটী রাখাল বালক তোমাকে রামের বাটীব রাস্তা দেখাইল। বামের বাটী সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান জন্মাইয়া দিল—অজ্ঞতা দূর করিয়া দিল। সে এ বিষয়ে তোমার পথ প্রদর্শক বা গুরুই জান। গুরু শব্দ ব্যবহার না কর পথ প্রদর্শক, বিজ্ঞ বা বিচক্ষণের মত নেওয়া বল উহাই গুরুগ্রহণ, গুরুকরণ। এজন্য শ্রীমদ্ভাগবতে আছে অবধূত বলিয়াছেন তাঁহাব ২৫ জন গুরু, তন্মধ্যে কাক, কুকুর, চিল, ইত্যাদিও আছে। যাহা হইতে যেটুকু শিখা যায় তজ্জন্য সে গুরু। যে যে বিষয় শিক্ষা দেয় সে তদ্বিষযে গুরু।

(সাধনার আবশ্যকতা।)

অনেকে মনে কবেন সদ্গুরু যদি মিলিল তবে আর কি? সাধন নাই; ভজন নাই, গুরু উপসন্নের কথাটী নাই, গুরু বাক্যে অহৈতুক বিশ্বাস পর্য্যন্ত নাই; কিন্তু অধ্যাত্ম বিদ্যাটী আমলকবৎ হস্তগত হওয়া চাই।

"ভজন পূজন সাধন বিনা
আমার গাঁজা ভিজবে কিনা!"

বাঙ্গালার লোক এতই অভিমানী ও আলস্যপ্রিয় যে, সে কত বিজ্ঞ, কি পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে, কতটুকু অধিকারী সে বিষয়ে চিন্তা করিবে না। এ কথা সর্ব্বদা জাগরূক থাকা চাই যে গুরু যাহা বলেন তাহা যেন অটুট রহে। নতুবা পূর্ব্ব সংস্কার দূরীভূত না হওয়ায় সে গুরুর অন্য উপদেশ গ্রহণের যোগ্যই হয় না। দেখ, চুম্বক লোহাকে কেমন আকর্ষণ

করে। ছোট স্থচটী পর্য্যন্ত লাফাইয়া চুম্বকের গায়ে ঢলিয়া পড়ে,—এতই আকর্ষণ। যদি ঐ স্থচটি মৃত্তিকা লেপন করিয়া চুম্বকের গায়ে ধর চুম্বক উহাকে আর টানিবে না। তদ্বৎ পঙ্কিল হৃদয়ে আসিলে গুরু তাহাকে টানিতে পারেন না। শুধু 'গুরু রক্ষা কব' বলিয়া চেঁচাইলে কি ফল। পিতা ছেলের পড়ার জন্য বই কিনিয়া দিতে পারেন, মাহিনা দিয়া গৃহে শিক্ষক রাখিয়া দিতে পারেন, কিন্তু ছেলের স্মৃতিতে বিদ্যা গাঁথিযা দিতে পারেন না। ছেলেব বিবাহ দিযা পুত্রবধূ গৃহে আনিতে পারেন কিন্তু বধুকে প্রীতির চক্ষে দেখা নাদেখা পুত্রের উপর নির্ভর করে। নিজে পুরুষার্থ না দেখাইলে পুত্রমুখ দর্শনরূপ স্থখ অসম্ভব।

সর্ব্বমেবেহ হি সদা সংসারে রঘুনন্দন।
"সম্যক্ প্রযুক্তাৎ সর্ব্বেণ পৌরুষাৎ সমবাপ্যতে ॥
সাধুপদিষ্ট মার্গেন যন্মনোঙ্গ বিচেষ্টিতম্।
তৎ পৌরুষং তৎ সফলমন্যদুন্মত্ত চেষ্টিতম্ ॥"

যোঃ বা, মু মু ৪।৮, ৪।১১

হে রঘুনন্দন, সর্ব্ব প্রযত্নের সহিত সম্যক্ পৌরুষ দেখাইলে সংসারে সর্ব্বদাই সকল বিযযে সফলকাম হওয়া যায়। সাধুগণ উপদিষ্ট পথে কায়মনোবাক্যে চলাই প্রকৃত পুরুষকার; তাহাতেই সফলতা আনয়ন করে, অন্য পুরুষকার উন্মত্ত চেষ্টা মাত্র।

(গুরু বাক্যে অবিচারিত বিশ্বাস।)

শিষ্য গুরুবাক্য বিষয়ে কোন তর্ক উত্থাপন না করিয়া অম্লান বদনে পালন করিতে বাধ্য। কিন্তু কোন কোন শিষ্য নিজ বুদ্ধি বৃত্তির চালনার দ্বারা গুরুবাক্য অবহেলন করেন। একদিন এক শিষ্যকে স্বামীজি (স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজ) এক রেলওয়ে ষ্টেসনে অপেক্ষা করার

কালে বলিলেন অমুক দোকানে ভাল পুরী আছে তাহা আনিয়া জলযোগ কর। কিন্তু তাঁহার সেই শিক্ষিত শিষ্য সেই দোকানে যাইয়া ঘৃতে ভাজা টাট্‌কা পুরী পরিত্যাগ করতঃ বাসি রসগোল্লা আনিয়া খাইতে আরম্ভ করিলেন। স্বামীজি জিজ্ঞাসা করিলেন 'কি খাইতেছ'? শিষ্য অম্লান বদনে উত্তর করিল "রসগোল্লা"। তখন স্বামীজি বলিলেন আমি পুরী আনিতে বলিলাম রসগোল্লা আনিলে কেন? তদুত্তরে শিষ্য উক্ত দোকানের পুরীতে ঘৃতের ভেজাল, মক্ষিকাদংষ্ট্রতা, ছুতিস্পর্শতা প্রভৃতি নানা দোষের বর্ণনা কবিল। সদ্‌গুরুর দৃষ্টিতে উহা যে অমৃতময় হইযাছে এইরূপ চিন্তা অহঙ্কার পরবশে তাহার হৃদয়ে স্থানও পাইল না। আপনাকে বুদ্ধিমান বলিয়া এতই অভিমান ও ভাবী অসুস্থতার জন্য এতই প্রযত্ন যে বয়োবৃদ্ধ, জ্ঞানবৃদ্ধ সদ্‌গুরুর বাক্যে অবহেলা করিলই করিল। এইরূপ শিষ্যের গুরু হইতে কোন বস্তু প্রাপ্তির আশা যে সুদূরপরাহত তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

গুরুবাক্যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস থাকা চাই। শুধু মুখে গুরু বলিলে কোন ফল নাই। ভগবান বলিয়াছেন।

"অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ।" গীতা ৪।৪০।

গুরূপদিষ্ট অর্থে অনভিজ্ঞ, অশ্রদ্ধা বিশিষ্ট এবং সংশয়চিত্ত ব্যক্তি স্বার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয়; সংশযাত্মা মানবের ইহলোকও নাই, পরলোকও নাই, সুখও নাই।

(প্রারব্ধ ও পুরুষকার।)

প্রত্যেক জীব প্রারব্ধ বশে কাজ করে। প্রারব্ধকে অম্লান বদনে ভোগ করিতে রাজি হয় না কেন? প্রারব্ধ স্বকৃতব্যাধি পূর্ব্ব

পুরুষার্থেরই ফল। ইহজীবনে ভুল করিলে তজ্জন্য যেরূপ ভুগিতে হয় ইহাও তদ্রূপ পূর্ব্বজীবনের ভুল জাত। পুরুষার্থ বেশী হইলে উহা ক্ষীণ হয়। অতএব নির্ভয়ে কাজ করিয়া যাও।

"তাবৎ তাবৎ প্রযত্নেন যতিতব্যম্ স্বপৌরুষম্।
প্রাক্তনং পৌরুষং যাবদশুভং শাম্যতি স্বয়ং॥"

যতক্ষণ না ঐহিক সৎকর্ম্ম দ্বারা প্রাক্তণ দুরদৃষ্ট পরাস্ত হয় ততক্ষণ ঐহিক সৎকর্ম্মে যত্ন করিবে।

দোষঃ শাম্যত্য সন্দেহং প্রাক্তনোঽদ্যতনৈর্গুণৈঃ
দৃষ্টান্তোঽত্র হ্যস্তনস্য দোষসাদ্য গুণৈঃ ক্ষয়ঃ॥

প্রাক্তন দোষ ঐহিক কর্ম্ম দ্বারা নিশ্চয়ই পরাস্ত হয়। ভাবী দোষ যে ঐহিক কর্ম্ম দ্বারা দূরীভূত হয় তাহাই এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত।

"অনর্থঃ প্রাপ্যতে যত্র শাস্ত্রিতাদপি পৌরুষাৎ।
অনর্থ কর্ত্তৃবলবৎ তত্র জ্ঞেয়ং স্বপৌরুষম্॥
পরং পৌরুষমাশ্রিত্য দন্তৈর্দন্তান্ বিচূর্ণয়ন্।
শুভেনাশুভ মুদ্যুক্তং প্রাক্তনং পৌরুষং জয়েৎ॥"

শাস্ত্রানুযায়ী কর্ম্ম করিলেও যথায় অনিষ্ট হয়, তথায় বুঝিবে অনিষ্ট-জনক পূর্ব্বকৃত দুষ্কর্ম্ম তোমার প্রবল। তখন অতি দৃঢ়ভাবে পুরুষার্থ দেখাইবে। জীবন যায় যাক্, আমি শাস্ত্রীয় কর্ম্ম করিবই স্থির করিয়া দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত করিয়া কর্ম্ম করিয়া যাইবে। ইহাতে ঐহিক পুরুষার্থ দ্বারা প্রাক্তন পুরুষার্থ বা দৈব জয় হইবেই হইবে। ইহা ভগবান্ বশিষ্ঠ দেবের বাক্য।

সাধনা করিতে গিয়া অনেকে অমুকের মত ত আমার হইতেছে না ইত্যাদি চিন্তায় হতাশ ভাবে বহু সময় বৃথা ব্যয় করেন ও উদ্যমে শিথিল হন; তাহা উচিত নহে। এক জীবনে কয়টী বৎসর মাত্র। তাহাতে

জীবন কৃতকৃত্য করা সকলের পক্ষে সম্ভবপব নহে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাধন দ্বারা যে যত অগ্রসর তাহার তত সত্বর উন্নতি লাভ ঘটিয়া থাকে। পূর্ব্বজন্মের মৃত্যুর সময় যাহার চিত্তে বিষয় চিন্তা ছিল তাহার চিত্ত তত বিষয় প্রবণ হইবে এবং যিনি ঈশ্বব চিন্তা করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন তাহাব চিত্ত উপাসনাদিতে স্বতঃই ধাবিত হইবে। ভগবান তাই গীতায় বলিযাছেন।

"যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজ্যত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥" গীতা ৮।৬।

পূর্ব্বজন্মের সাধন থাকিলে এ জন্মে অল্প সাধনেই কার্য্য সম্পন্ন হয়। যাঁহাদের পূর্ব্বজন্মের সাধনরাশি সঞ্চিত আছে তাঁহাদের পক্ষে।

"ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতি রেকা
ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা।"

এই কথাটী সার্থক হইযা থাকে। সাধন সাহায্যে পূর্ব্ব হইতেই হৃদয নির্ম্মল না হইলে সাধুসঙ্গ দ্বারা হঠাৎ জ্ঞান লাভ হইতেই পারে না।

"পর্ব্বজন্মার্জ্জিতা বিদ্যা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতং ধনং।
পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতং পুণ্যং অগ্রে ধাবতি ধাবতি॥'
(মহাভারত)

পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বিদ্যা, ধন ও পুণ্য অগ্রে ধাবিত হয়।
ধ্রুব, বিদুর প্রভৃতির পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সাধনই প্রধান সহায় ছিল।

(পার্থিব উন্নতির জন্য সদ্ গুরুর আশ্রয় চাহিওনা।)

অধ্যাত্ম বিদ্যার জন্যই সদ্গুরুর আবশ্যক। মোকদ্দমা জিতিতে হইলে আইনজ্ঞ গুরু, অসুখ আরোগ্য করিতে হইলে ডাক্তারই গুরু

পার্থিব বিষয়ের গুরু পার্থিব ব্যবহারে পটু হইবে। পারমার্থিক গুরুর পরমার্থ জ্ঞান থাকা চাই।

অনেকে পার্থিব উন্নতির জন্য সদ্‌গুরুর আশ্রয় চাহে। ইহার কারণ কোন কোন মার্গভ্রষ্ট যোগী বিভূতি মার্গ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াই রোগ মুক্ত করা স্বর্ণ প্রস্তুত করা অথবা পুত্রেষ্টি যাগাদির দ্বারা পার্থিব ইষ্ট সাধনের ব্যবসায় করিয়া থাকে। তাহাকে পার্থিব গুরু বলিয়াই জানিবে। যে ব্যক্তি সর্ব্বস্ব ত্যাগ কবিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছে সে যে কাহারও পার্থিব উন্নতির সাথী হইবে না ইহা সহজ বোধগম্য। প্রকৃত জ্ঞানীর দয়া মায়া থাকে না। উহা বন্ধনের লক্ষণ। কাহারও বা শুধু ব্যবহারিক ভদ্রতা মাত্র অবশিষ্ট থাকে। মায়িক স্থূল বা সূক্ষ্ম শরীরস্থিত সুখ দুঃখের নিরাকরণ জন্য দয়া মায়ার সৃষ্টি; কিন্তু যে সন্ন্যাসী সে ঐ সকল শরীবের অস্তিত্বে বিস্মৃতি আশ্রয় করে। তবে ব্যবহাবিক সত্তায় যতক্ষণ শরীর আছে ততক্ষণ বালকবৎ বা উন্মাদের ন্যায় দেহের ধর্ম্ম শুধু বক্ষা করে।

চতুর্থ বল্লী।

(গুরু বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস চাই।)

বাল্যকালে হৃদয় সুমার্জ্জিত কাষ্ঠ বা প্রস্তরফলকবৎ দাগ মাত্র গ্রহণের উপযুক্ত থাকে; তখন যেরূপ সরল বিশ্বাসে শিশু সব উপদেশ গ্রহণ করে তেমনি ভাবে গুরুবাক্য বা শাস্ত্র বাক্য গ্রহণ করা চাই, তেমনি বিশ্বাস থাকা চাই। শিশু খেলিতে খেলিতে পায়ের অঙ্গুলীতে আঘাত পাইয়া রক্তদর্শনে কাঁদিয়া মায়ের নিকটে গেল, কর্ম্মে

নিযুক্তা জননী আঘাত সামান্য দৃষ্টে ও কর্ম্মে ব্যাঘাত না হওয়ার জন্য বলিয়া দিলেন যা 'ফু' দিয়াছি ; 'পিপড়ি' (বেদনা) সারিয়াছে। অমনি সরল বিশ্বাসে 'পিপড়ি' সারিয়াছে বলিয়া শিশু দৌড়িয়া খেলিতে গেল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার বেদনা বোধও রহিত হইল। গুরু বাক্যে এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস চাই।

অসুস্থ ছেলে বারম্বার ভাণ্ডার ঘরে যাইতেছে দেখিয়া মা বলিলেন, 'খুকু ঐদিকে যোযো না, জুজু আছে।' খুকুর দৃঢ় বিশ্বাস হইল ঐদিকে জুজু আছে, সে আর সেই দিকে যায় না। ঐ ছেলের ব্যারাম সারিলে পিতা একদিন বলিলেন "খোকা ভাণ্ডার হইতে কমলা লেবু লইয়া আয়।" খোকা বলিল "না ওদিকে আমি যাব না জুজু আছে।" তখন পিতা চাকরকে বলিলেন "যাত লাঠি লইয়া জুজুকে মারিয়া ফেলিয়া আয়।" চাকর ভাণ্ডার ঘরে গিয়া বেড়াতে আঘাত করতঃ একটী কিছু গামছা ঢাকা দিয়া লইয়া গিয়া বলিল জুজু মারিয়া ফেলিয়াছি। শিশু তখন নির্ভয়ে ভাণ্ডার ঘরে প্রবেশ করিল। এইরূপ জ্বলন্ত বিশ্বাস না হইলে আধ্যাত্মিক রাজ্যে অগ্রসর হওয়া যায় না।

(শৃগাল ও রাজার গল্প।)

এক রাজা শীকারে গিয়া এক শৃগালকে লক্ষ্য করিলেন। শৃগাল বলিয়া উঠিল "মহারাজ" আমাকে মারিলে চৌদ্দ ভুবন মারা যাইবে। রাজা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "সেকি চৌদ্দ ভুবন মারা যাইবে? তবেত আমিও মরিব।" শৃগাল বলিল হাঁ মহারাজ! তুমি মরিলে চৌদ্দ ভুবন কোথায় থাকে? সংকল্পই চৌদ্দ ভুবন। সংকল্প না থাকিলে চৌদ্দ ভূবন থাকে না।

"ঈক্ষণাদ্যা প্রবেশান্তা সৃষ্টিরীশেণ কল্পিতা
জাগ্রাদাদি বিমোক্ষান্তা সংসারো জীবোকল্পিতঃ॥" (পঞ্চদশী)

তিনি আলোচনা করিলেন আমি বহু হইব। তৎপর তিনি সূক্ষ্ম সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনুপ্রবেশ করিলেন। ইহাই ঈশ্বর কল্পিত সৃষ্টি। জাগ্রত স্বপ্ন হইতে মুক্তি লাভ পর্য্যন্ত অবস্থায় যে বিশ্ব প্রপঞ্চ দৃষ্ট হয় সেই সংসার জীবেরই কল্পিত।

রাজা শৃগাল বাক্যে বিশ্বাস করিয়া কল্পিত জগৎ ত্যাগে উহার মূল সৎকে আশ্রয় করিয়া সেই বনেই রহিয়া গেলেন। তিনি বিশ্বাস করিলেন রাজ্যপাট শীকারাদি সবই স্বপ্নবৎ অলীক কল্পনাপ্রসূত।

গুরুমুখে শ্রুতবাক্যে এইরূপ বিশ্বাস চাই ও উহা ধারণা করা চাই, নতুবা শুনিয়া কোন ফল নাই। উপরোক্ত উদাহরণে শৃগালবাক্যে রাজা বুঝিলেন যে কোন জ্ঞানী উহাতে প্রবিষ্ট আছেন। তাই উহার বাক্যে জগৎ কল্পিত বিশ্বাস করিয়া রাজা রাজ্য ত্যাগ করিলেন। জ্ঞানীর স্থূলদেহ ত্যাগ সহকারে, লিঙ্গ ও কারণ শরীরদ্বয়ও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ইহাকে বিদেহ মুক্তি কহে।

জ্ঞানী জানে চৌদ্দ ভুবন মায়ার খেলা, স্বপ্নবৎ অলীক। দেহাত্মবুদ্ধি বশতঃ মনসংকল্পে জগৎ সৃষ্ট; সেইজন্য দেহাত্মক বুদ্ধি দূর হইলে কল্পিত ভুবনও লয় প্রাপ্ত হয়। দেহাত্মবুদ্ধিশূন্য জ্ঞানীর চক্ষে রাজার ভৌতিক দেহেরও কোন অস্তিত্ব নাই। ব্রহ্ম অখণ্ড, কাজেই রাজার কোন খণ্ড আত্মা নাই বা থাকিবে না; সুতরাং জ্ঞানোদয়ে রাজার সম্পূর্ণ বিনাশ। চৌদ্দ ভুবনের নানা কর্ম্ম-জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হইলে, পুনর্জ্জন্ম না থাকায় সর্ব্বতো-ভাবে পরিচ্ছিন্নত্বের, লোপ হইবে। দেহাদি ভাব যে ব্যবহারিকসত্তা তাহার একান্ত বিলোপ, এইরূপ বুঝিয়া রাজার বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে শৃগাল দেহস্থিত ঐ জ্ঞানীর বাক্যের শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনে রত হইয়া রাজ্যাদি ত্যাগ করিলেন। শৃগালরূপী হইলেও জ্ঞানী জানিয়া, তদ্বাক্য গুরুবাক্য জ্ঞানে বিশ্বস্তচিত্তে রাজ্যাদি এষনাত্রয় ত্যাগে জ্ঞানমার্গে অগ্রসর হইলেন।

(বহুরূপীর গল্প।)

এ সম্বন্ধে আরও শুন—কোন এক রাজার বাড়ীতে এক সাধু বহুরূপী সাজিয়া আসিয়াছিল। তিনি অন্যান্য সাজ দিবার পর রাজা ও রাণী বাঘের সাজ দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিলে, তিনি তাহাতে পুনঃ পুনঃ অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন ও বলিলেন ব্যাঘ্র অতি দুঃস্বভাবযুক্ত; তদনুকরণ জন্য সাজ ব্যবহার ভাল নহে। রাজা ও রাণীর জেদ হওয়ায়, সাধু বাঘ সাজিয়া আসিয়া খেলিতেছেন ও ছুটাছুটি করিতেছেন এমন সময়ে রাজকুমার বাঘের গোঁফ্ ধরিয়া টানিতে গেলে, ব্যাঘ্রভাবে ভাবিত বহুরূপী রাজকুমারের গাত্রে থাবার আঘাত করিলেন। রাজকুমার পড়িয়া গিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। রাজপুরীতে কান্নাকাটি লাগিল। তখন বহুরূপী বাঘের সাজ ত্যাগ করিয়া, রাজার নিকট আসিলে, সাধুতে বিশ্বাসী রাজা বিনয়ের সহিত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এখন কি করা যায়?' সাধু উত্তর করিলেন, 'মহারাজ! আপনার ত বাক্যে আস্থা নাই। পুনঃ পুনঃ বলিলেও আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করেন নাই। সাজ দিতে বাধ্য করিলেন। আপনাকে আর বলিব কি? যদি বিশ্বাস করেন ত এখনও ছেলে বাঁচিতে পারে।' রাজা আশ্বাস পাইয়া জিজ্ঞাসিলেন, কি করিলে বাঁচিতে পারে? তদুত্তরে সেই মহাপুরুষ বলিলেন, এই মৃতদেহ এখানেই থাকুক, কেহ যেন স্পর্শ না করে। কল্য নারায়ণ সাজ ধরিয়া আসিব। যদি তখন নারায়ণ ভাবে পূজা করিয়া চরণামৃত মুখে দেন ও সিঞ্চন করেন তবেই বাঁচিবে। রাজা ও রাণী তৎশ্রবণে সাধু বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করতঃ, তথায় মৃতদেহ প্রহরীবেষ্টিত রাখিয়া অনিদ্র রহিলেন এবং নারায়ণ পূজার সবিশেষ আয়োজন করিতে আদেশ করিলেন। পর দিবস প্রভাতে স্নানাদি করিয়া, নারায়ণ পূজার উপকরণ লইয়া, নারায়ণরূপী সাধুর

আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। বড়ই উৎকণ্ঠিত চিত্তে ব্যাকুল হৃদয়ে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে, সাধু 'নারায়ণ' সাজিয়া আসিলেন। তখন রাজা ও রাণী ভক্তি গদ গদ চিত্তে তাঁহাকে স্বয়ং নারায়ণ জ্ঞানে অর্চ্চনা করিয়া তৎপাদোদক মৃত বালকের মুখে ও গাত্রে সিঞ্চন করিলেন। রাজপুত্র নিদ্রাভঙ্গে উত্থানের ন্যায় উত্থিত হইলে সকলের আনন্দের সীমা রহিল না। তাহারা রাজা ও রাণীর বিশ্বাস-মাহাত্ম্যকীর্ত্তন ও সাধু সেবা করিতে লাগিল। বিশ্বাসের এমনি মহিমা।

সাধুবাক্য অবিচারিতভাবে পালন করিলে, অল্পকালে কিরূপ মহৎ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার গল্প শুন।

(মনের কথা শুনিবিনা গল্প।)

এক স্থানে এক মহাপুরুষের শুভাগমন হইয়াছিল। উহা কোন ধনীর গৃহে হওয়ায়, কৃষকদিগের পক্ষে সেখানে আসিয়া সাধুদর্শন দুঃসাধ্য ছিল। এক কৃষক ঐ গৃহের পার্শ্ব দিয়া নিজ ক্ষেত্রে যাতায়াত কালে প্রতিদিন বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে ঐ সাধুর সঙ্গ করিতে দেখিত। ইহাতে তাহার প্রাণে সাধুসঙ্গ করার তীব্র অভিলাষ জন্মিল। সে ঐ বাটীর বাহিরে সাধুকে দেখিতে পাইলে তাহার উপদেশ শ্রবণে নিজকে চরিতার্থ করিবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিল। একদিন সে দুই কাঁধে হাল, মস্তকে বীজের ঝাঁকা ও হাতে বলদ দুইটীর বন্ধন-রজ্জু ধরিয়া ক্ষেত্রের দিকে যাইতেছে, এমন সময় দেখিতে পাইল ঐ মহাপুরুষ ক্ষেত্রের পার্শ্ব-দিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছেন। কৃষক তাড়াতাড়ি দড়ি ছাড়িয়া, করযোড়ে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। সাধুর দৃষ্টি তৎপ্রতি আকর্ষিত হইলে তিনি দাঁড়াইলেন। কৃষক, বহুদিনের সাধ পুরাইবার সুযোগ না ছুটিয়া যায় এই আশঙ্কায়, শিরের বোঝা ও কাঁধের হাল না নামাইয়াই, আবেগ ভরে কিছু উপদেশ

প্রার্থনা করিল। কৃষকের এইরূপ ব্যাকুলতা দেখিয়া সেই মহাপুরুষ তাহাকে কিছু উপদেশ দিতে ইচ্ছা করিলেন; কিন্তু এরূপ অশিক্ষিত কি উপদেশ দিবেন ভাবিয়া চিন্তিত হইলেন। ক্ষণেক পরে বলিলেন "দেখ্, যদি উপদেশ অনুযায়ী কাজ করিতে স্বীকার করিস্ তবে উপদেশ দেই।" কৃষক বলিল, "ঠাকুর উপদেশ পালনে যদি প্রাণও যায় তথাপি তোমার আদেশ পালনে পরাঙ্মুখ হইব না। কৃষক এই কথাগুলি এমনই দৃঢ়তা ও প্রেমভরে বলিল যে সাধু বুঝিতে পারিলেন পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির ফলে ইহার এই সুসময় উপস্থিত হইয়াছে। তখন শুধু এই কথাটী বলিলেন, "যা, মনের কথা শুনিস্ না।" কৃষক এই আদেশ শিরোধার্য্য করিলে, সাধু চলিয়া গেলেন। তখন কৃষকের মন বলিল 'এখন ত তোর সাধুসঙ্গের অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে, কাঁধের ও মস্তকের বোঝা নামা।' সে বলিল, তোর কথা শুনিব না। তখন মন যুক্তি দেখাইয়া বলিল, ছেলে পিলে মানুষ করিবি ত হাল জুড়িবার জন্য বলদ ধরিয়া আন। বীজ বুনিবার সময় ত যায়। চাষা বলিল, না, মনের কথা শুনিব না। মন বলিল, চাষ না করিলে সংসার করিবি কি করিয়া। চাষা উত্তর করিল, এই ষাট বৎসর ধরিয়া তোর কথা মত চলিয়া আসিয়াছি, আজ গুরুদেবের কথা শুনিব, চাষ করিব না। চাষা তামাক খাইতে ভালবাসিত। মনে হইল তামাক খায়; কিন্তু তখনি উহা মনের কথা ভাবিয়া, উহা হইতে বিরত হইল। বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকাতে কাঁধের লাঙ্গল নামাইয়া বিশ্রাম করিতে ইচ্ছা হইল; কিন্তু সে গুরুবাক্য রক্ষায় অচল, অটল। মনের ইচ্ছা মনেই মিলাইয়া দিল, বসিল না। ক্রমে আহারের সময় উপস্থিত হইলে গৃহে ফিরিবার ইচ্ছা হইল। সে মনের কথা শুনিল না। সেই সঙ্কল্পও ত্যাগ করিল। বিলম্ব দেখিয়া তাহার স্ত্রী আসিয়া কত অনুরোধ করিল। তাহার মন

স্ত্রীর সহিত গৃহে যাইতে অস্থির করিয়া উঠাইল। কিন্তু মনের কথা সে শুনিবে না। সে কিছুতেই গুরুর আদেশ লঙ্ঘন করিবে না। পূর্ব্বের মত নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। ঐ দণ্ডায়মান অবস্থায় তাহার প্রস্রাব ও বাহ্যের বেগ হইল। মন তাহাকে শৌচ কর্ম্ম করিবার জন্য বলিল, সে মনের কথা শুনিল না। দণ্ডায়মান অবস্থাতেই তাহার বাহ্য ও প্রস্রাব হইয়া গেল। সে শৌচ করিতে গেল না। এইরূপে তিন দিন অতিবাহিত হইল। জল পর্য্যন্ত পান না করায় তাহার প্রাণত্যাগের সম্ভাবনা হইল। কিন্তু সে কিছুতেই বিচলিত হইল না। গুরুবাক্যে অটল রহিল। তাহার এই দৃঢ়তায় ভগবানের আসন টলিল। ভগবান, লক্ষ্মী দেবীকে তাহার জন্য পেয় ও আহার্য্য লইয়া যাইতে বলিলেন। লক্ষ্মী দেবী তদ্রূপ করিলে, চাষা সেই পেয় ও আহার্য্য কিছুতেই গ্রহণ করিল না। কারণ ঐ পেয় ও আহার্য্য দৃষ্টে তাহার মন উহা গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়াছে; সে ঐ লোলুপ মনের কথা শুনিবে না, স্নুতরাং লক্ষ্মী দেবীর ঐ অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিল না। তখন লক্ষ্মী দেবী তাহাকে বলিলেন, আমার কথা না শুনিলে তোর ভাল হইবে না। চাষা বলিল, মা, আমার মন তোমার কথা শুনিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে। কিন্তু কি করি, গুরুদেবের আদেশ, "মনের কথা শুনিবি না।" প্রাণ যায় সেও ভাল গুরুদেবের আদেশ অমান্য করিব না। তুমি অসন্তুষ্টা হইও না। এই ব্যাপার দেখিয়া, লক্ষ্মী বিস্মিতা হইয়া ফিরিয়া গেলেন এবং ভগবৎ সমীপে সমস্ত নিবেদন করিলেন। তখন ভগবান স্বয়ং চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে আহার্য্য হস্তে সেই চাষার নিকট উপস্থিত হইলেন। চাষা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে? কি জন্য আসিয়াছ? ভগবান বলিলেন, দেখিতেছিস্ না! আমি স্বয়ং বিষ্ণু; তোর অদৃষ্ট স্নুপ্রসন্ন; তোকে বর দান করিতে আসিয়াছি।

তুই যাহা চাহিবি তাহাই তোকে দিব। ধন, জন, পুত্র, পরিজন যাহা কিছু আবশ্যক হয় মাঙ্গিয়া লও। আর এই সুরসাল, সুগন্ধিপূর্ণ আহার্য্য অমৃতস্বরূপ, ইহা গ্রহণ কর। দেবতার দিব্য মূর্ত্তি, অমৃত-নিশ্যন্দিনী বাক্য ও আহার্য্যের সুগন্ধি তাহার মন মুগ্ধ করিল। তিনদিন উপবাসী থাকায়, পেয় গ্রহণ জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইল। মন বলিল, অমৃত গ্রহণ করিয়া তোর জীবন ধন্য কর; কিন্তু গুরুর উপদেশ "মনের কথা শুনিবি না।" তখন চাষা ভগবানকে বলিল, ঠাকুর, তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও। আমি তোমাকে কি তোমার প্রদত্ত বর বা আহার্য্য কিছুই গ্রহণ করিতে চাই না। কারণ মন উহা পাইতে লোলুপ হইয়াছে। আমি মনের কথা শুনিব না। ভগবান দেখিলেন, চাষা সুমেরু শৃঙ্গের ন্যায় অচল, অটল।

ভগবান সুপ্রসন্ন হইয়া তাহাকে গুরুবাক্যে আস্থা রাখার জন্য বহু প্রশংসা করিলেন এবং বলিলেন, 'গুরু যাহা বলেন তাহা ত শুনিবি?' সে বলিল, "হাঁ, গুরু যাহা বলেন তাহা শুনিব"। তখন ভগবান স্বয়ং গুরুর গৃহে গমন করতঃ তাঁহাকে লইয়া আসিলেন। সাধু চাষাকে বলিলেন, "ধন্য তোর সাধনা, আজ তোর পুণ্যবলে আমি ভগবদ্দর্শন লাভ করিলাম। এখন যা, স্নান করিয়া আয়।" চাষা স্নান করিয়া আসিলে, গুরু এবং শিষ্য শ্রীভগবানের অর্চ্চনা করিয়া কৃতার্থ হইলেন এবং গুরুবাক্যে চাষা তখন সেই আহার্য্য গুরুকে নিবেদন করিয়া প্রসাদ লাভে কৃতার্থ হইল।

নিরক্ষর চাষার প্রাণে "ন গুরোরধিকং" বাক্যে অচলা শ্রদ্ধা ছিল বলিয়াই, সে ভগবানকে পর্য্যন্ত আহার্য্য লইয়া ফিরিয়া যাইতে বলিয়াছিল। গুরুতে এমনি দৃঢ়নিষ্ঠা চাই। এই চাষা মনের বশ্যতা অস্বীকার করিয়া যেই বাসনাশূন্য হইয়াছে, অমনি তাহার নির্ম্মল হৃদয় ভগবদাসনের উপযোগী হইয়াছে ও ভগবদ্দর্শন মিলিয়াছে।

পঞ্চম বল্লী।

(শরীর কি ?)

এ শরীর কি ? শীর্য্যতে বয়োভির্বাল্য-কৌমার-যৌবন-বার্দ্ধক্যাদিভিশ্চ ইতি শরীরম্। পুনশ্চ, "দহ ভস্মীকরণে ইতি ব্যুৎপত্ত্যা চ দেহো ভস্মীভাবং প্রাপ্নোতি" অর্থাৎ যাহা শীর্ণাদি ভাববৈলক্ষণতা প্রাপ্ত হইয়া বাল্য, কৌমার, যৌবন, বার্দ্ধক্যাদি যুক্ত হয়। পুনশ্চ, দহ ধাতু অর্থ পোড়াইয়া ফেলা ; দেহ অর্থ যাহা ভস্মীভূত হয় অর্থাৎ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। দেহ ও শরীর উভয় শব্দই ক্ষণভঙ্গুরত্ব-জ্ঞাপক।

এই ক্ষণভঙ্গুরতা দর্শনে, আধ্যাত্মিক (দৈহিক ও মানসিক কারণে জাত), আধিভৌতিক (ব্যাঘ্র তস্করাদি ভূত অর্থাৎ প্রাণিকৃত) ও আধিদৈবিক (ভূমিকম্প, দাবানল, বন্যা, অশনিপাতাদিজন্য), এই ত্রিবিধ দুঃখে দগ্ধ হইয়া যে বিচার করে, সে দেখিতে পায় যে, মাতৃরক্ত ও পিতৃবীর্য্যরূপ মল দ্বারা পরিপুষ্ট এই শরীর কেবল মাত্র মল, মূত্র, শ্লেষ্মা প্রভৃতির আশ্রয় স্থল। দেহের প্রতিরন্ধ্র হইতে দুর্গন্ধযুক্ত মল নির্গত হয়। ব্রণাদি হইলে উহাকে যেরূপ মলম ও পট্টি দ্বারা আচ্ছাদিত করিতে হয় তদ্রূপ ব্রণসদৃশ এই দেহকেও অন্নরূপ মলম ও বস্ত্ররূপ পট্টি দ্বারা পোষণ করিতে হয়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দেহের বৃদ্ধি ও পরে ক্ষয় হইতে থাকে। বাল্যে যে ভাব ছিল যৌবনে তাহা আর নাই, আবার যৌবনের কান্তিটুকু বার্দ্ধক্যের জরার সহিত মিলাইয়া যায়। শ্মশানের ভস্মরাশিতেই ইহার পরিণতি।

(সাধন ও ব্রহ্মচর্য্য)।

যিনি আত্মজ্ঞানের অভিলাষী, তিনি সংসারের বিত্তাদি লাভ জন্য গুরুর নিকট প্রার্থী হন না। তাঁহাকে সাধন চতুষ্টয়ের আশ্রয় লইতে হয়। সুখ, দুঃখ, রোগ, শোক, মান, অপমান ইত্যাদির দ্বন্দ্ব সহ্য করাই ধর্ম্মপথের প্রধান অনুষ্ঠেয়। সাধনচতুষ্টয় দ্বারা সূঁচের ন্যায় পরিষ্কৃত না হইলে, চুম্বকরূপী সদ্‌গুরু টানিবেন কেন? পরমপুরুষার্থস্বরূপ আত্ম-জ্ঞান লাভ, ব্রহ্মচর্য্যাদি, তপস্যাচরণ ও সাধনসাপেক্ষ। যাহার ব্রহ্মচর্য্য নাই, তাহার আবার সাধন কি? ব্রহ্মবিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞান তাহার ধারণা শক্তির বহির্ভূত। শ্রুতিতে আছে—

> "তান্ হ স ঋষিরুবাচ—ভূয় এব তপসা
> ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া সংবৎসরম্ সংবৎস্যথ
> যথাকামং প্রশ্নান্ পৃচ্ছত। যদি বিজ্ঞাস্যামঃ
> সর্বং হ বো বক্ষাম" ইতি (প্রশ্নোপনিষৎ ১।২)।

দ্বাদশ বর্ষের অধিক তপোনুষ্ঠানকারী সেই শিষ্যদিগকে পিপ্পলাদ ঋষি বলিলেন, তোমরা আবার আমার কাছে থাকিয়া এ বৎসর সবর্ণোচিত ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ব্রহ্মচর্য্য শ্রদ্ধা সহকারে (গুরু ও বেদ বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক) আচরণ কর। পরে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে স্বীয় শক্তি অনুসারে তাহার উত্তর দিব।

পুনশ্চঃ—"তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকো যেষাম্ তপো ব্রহ্মচর্য্যং যেষু সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্।" (ইতি প্রশ্নোপনিষদ ১।১৫)।

সত্য, ব্রহ্মচর্য্য ও তপস্যা যাহাদের চির প্রতিষ্ঠিত, ব্রহ্মলোক তাঁহাদেরই। ছান্দোগ্য শ্রুতির অষ্টম অধ্যায়ে আছে যে স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র ১০১ বৎসর ব্রহ্মচর্য্যের পর আত্মবিদ্যা আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

অপিচ, "ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ যজ্ঞোঽধ্যয়নম্ দানমিতি প্রথমস্তপ এব দ্বিতীয়ো ব্রহ্মচার্য্যাচার্য্যকুলবাসী তৃতীয়োঽত্যন্তমাত্মানমাচার্য্যকুলেঽ-বসাদয়ন্।" (ছান্দোগ্য ২।২৩)

ধর্ম্মের তিনটী শাখা—প্রথম যজ্ঞ, দান ও অধ্যয়ন , দ্বিতীয় তপস্যা, চান্দ্রায়ণাদি , তৃতীয় আচার্য্যকুলে বাস করিয়া ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান।

অপিচ,—"অথ যদ্ যজ্ঞ ইত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তৎ। ব্রহ্মচর্য্যেণ হ্যেব যো জ্ঞাতা তং বিন্দতে। অথ যদিষ্টমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তৎ। ব্রহ্মচর্য্যেণ হ্যেবেষ্ট্বাত্মানমনুবিন্দতে। (ছান্দোগ্য ৮।৫।১)"

ব্রহ্মচর্য্যই যজ্ঞ। যিনি জ্ঞাতা (ব্রহ্ম) তাঁহাকে ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারাই জানা যায়। ব্রহ্মচর্য্যই ইষ্ট, ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারাই আত্মারূপী ইষ্টকে জানা যায়।

অস্ত্র লাভের জন্য অর্জ্জুন যখন স্বর্গে যান তখন তাঁহার পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য। এই ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিতে যাইয়াই তিনি উর্ব্বশীর কামাভিলাষ চরিতার্থ করিতে অক্ষম হয়েন। অবশেষে উর্ব্বশীর অভিশাপে ক্লীবত্ব পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হন। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যের ফলে ঐ ক্লীবত্ব সুখের কারণ হইয়াছিল।

অপিচ,—

"সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা।
সম্যগ্‌জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যং ॥" (মুণ্ডক ৩।৫)

ব্রহ্মচর্য্য, সত্য, তপস্যা ও সম্যক্ জ্ঞান দ্বারা এই আত্মাকে লাভ করা যায়। আত্মাকে লাভ করিতে হইলে, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম্, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই অষ্টাঙ্গ যোগের সাহায্যে অগ্রসর হইতে হয়। উহারা উপরতির কারণ ও ব্রহ্মচর্য্যের সাফল্যের হেতু। বীর্য্যরক্ষণপক্ষে সিদ্ধাসন (অর্থাৎ গুদমূলে বাম পায়ের গোড়ালি রাখিয়া বসিলে যে আসন হয়) অতীব উপযোগী। শারীরিক ব্যায়াম বা পরিশ্রম বীর্য্যরক্ষণের সহায়তা করে। কখন কোন যুবতীদর্শনে চাঞ্চল্য

হইলে, 'বুক ডন' ও দৌড়ানাদি শারীরিক শ্রম করিলে উহা নিবৃত্ত হয়। ব্রহ্মচর্য্য আচরণের সময় পথে এমন ভাবে চলা উচিত যে, স্ত্রীলোকের চরণব্যতীত উপরার্দ্ধে দৃষ্টি পতিত না হয়। আহারের সময় ইহা মিষ্ট, ইহা তিক্ত, এরূপ আলোচনা না করিয়া, ঔষধসেবনবৎ আহার গ্রহণ করিবে। গীতার সপ্তদশ অধ্যায়োক্ত সাত্ত্বিক আহার গ্রহণ করিবে। অতিরিক্ত আহার অবিধেয়। খাদ্যদ্বারা অর্দ্ধাংশ, জলদ্বারা চতুর্থাংশ ও বায়ুব ক্রিয়ার জন্য অবশিষ্ট চতুর্থাংশ রাখিবে। গুরুজন উপস্থিত হইলে তাঁহাদের প্রণাম ও আজ্ঞা পালনে তৎপর থাকিবে।

(প্রাণবায়ু)।

বায়ুই প্রাণ। উহাতে স্থিত অম্লজান যোগে জীবন রক্ষা ও পরিপাকাদি হয়। সুতরাং বায়ুর জন্য স্থান রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য। স্থূলদেহে ভোগ সাধনেব জন্য যে সব ইন্দ্রিয়াদি বর্ত্তমান তাহাদের মধ্যে প্রাণই শ্রেষ্ঠ; কারণ, সুষুপ্তি (গাঢ় নিদ্রা) কালে যখন মন, বুদ্ধি প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার স্থগিত থাকে, তখনও প্রাণের কাজ চলিতে থাকে। ইহার বিশ্রাম নাই। ইহার বিশ্রামই মৃত্যু। এই প্রাণ বায়ুকে প্রাণায়াম দ্বারা সংযত করিলে তদ্বারা অপর ইন্দ্রিয় বৃত্তির সংযম ও আয়ুবৃদ্ধি হয়। ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে প্রাণের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে এক দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ আছে। কোন সময় ইন্দ্রিয়গণ মধ্যে কে বড় এ বিষয় লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়। তাহারা মীমাংসার জন্য প্রজাপতি সন্নিধানে গমন করেন। প্রজাপতি বলিলেন, "যস্মিন্ উৎক্রান্তে শরীরম্ পাপিষ্টতরমিব দৃশ্যেত স বঃ শ্রেষ্ঠঃ।" অর্থাৎ—তোমাদিগের মধ্যে যিনি উৎক্রমণ করিলে শরীর পাপিষ্ঠতর (অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা হেয়) হয় সেই শ্রেষ্ঠ। তখন একে একে চক্ষু প্রভৃতি সকলে উৎক্রমণ (শরীর ত্যাগ) করিলেন। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের শরীর ত্যাগে, শরীর কখনই ধ্বংস

পথে যায় নাই বা অন্য ইন্দ্রিয়েরও কার্য্য স্থগিত হয় নাই। সর্ব্বশেষে প্রাণ উৎক্রমণ করিতে চেষ্টা করিলেই সকল ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার রোধ হইতেছে দেখিয়া, ইন্দ্রিয়গণ প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিলেন এবং 'উৎক্রমণ করিও না' বলিয়া প্রাণকে অনুরোধ করিলেন।

(প্রাণায়াম)।

প্রাণের অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার রোধ করিবার শক্তি আছে। তাই প্রাণায়াম উপাসনার একটী শ্রেষ্ঠঅঙ্গ। "প্রাণায়ামৈস্ত্রিভিঃ পূতস্তত ওঙ্কারমর্হতি।" ইতি (মনু ২।৭৫) অর্থাৎ তিনবার প্রাণায়ামের দ্বারা দেহ পবিত্র হইলে ওঁঙ্কার উচ্চারণের যোগ্য হয়। অপিচ,

"দহ্যন্তে ধ্যায়মানানাম্ ধাতুনাম্ হি যথা মলঃ।
তথেন্দ্রিয়ানাং দহ্যন্তে দোষঃ প্রাণস্য নিগ্রহাৎ॥
প্রাণায়ামৈ র্দহেদ্দোষান্ ধারণাভিশ্চ কিল্বিষম।
প্রত্যাহারেণ সংসর্গাদ্ ধ্যানেনানীশ্বরান্ গুণান্॥"

যোগদীপিকা।

যেমন অগ্নিতাপে স্বুবর্ণাদি ধাতু নির্ম্মল হয় তদ্বৎ প্রাণায়াম দ্বারা ইন্দ্রিয়দোষ দগ্ধ হয়। প্রণায়াম দ্বারা অনুরাগাদি দোষ দহন করিয়া ধারণার দ্বারা পাপ, প্রত্যাহার দ্বারা বিষয়সংসর্গ হইতে ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাবৃত্ত কর। ধ্যান দ্বারা অনীশ্বর গুণ, কাম, ক্রোধাদি বিনষ্ট হয়। এই ধ্যান, ধারণাদি দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে কর্ম্মের শেষ হইয়া অধ্যাত্ম বিদ্যাশ্রয়ে স্বয়ম্প্রভ জ্ঞানের বিকাশ হয়।

"যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে" (গীতা ৫।১১।)
যোগীগণ বিষয়সংসর্গত্যাগে চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম্ম করিয়া থাকেন।

(মানব জীবনের সফলতা)।

অধ্যাত্মবিদ্যা লাভ দ্বারা মনুষ্য জীবন ধন্য করিতে হইলে এই তিনের

আবশ্যক। মনুষ্যত্বং, মুমুক্ষত্বং, মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ। এই তিনটীর একটীরও অভাব হইলে আত্মদর্শন বা পরমপুরুষার্থসাধন সম্ভবপর নহে। সার্দ্ধত্রিহস্তপরিমিত মনুষ্যদেহ পরিপোষণ মনুষ্যত্ব নহে। যাহা প্রাণী সাধারণ হইতে মানুষের বিশেষ সম্পত্তি তাহাই মনুষ্যত্ব।

বাস্তবিক পক্ষে আমিত্বসূচক বস্তু সাড়ে তিন হাতেই পরিচ্ছিন্ন নহে। ঘটে ঘটে যে 'অহং' বা আমি ইহাই সর্ব্বব্যাপী আত্মা।

ঈশা বাস্যং। (ঈষোপনিষদ।) ঈশা অর্থাৎ আত্মার দ্বারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আচ্ছাদিত। একই সময়ে, একই স্থানে, একের অধিক বস্তু থাকিতে পারে না। ইহা গণিত শাস্ত্রে স্বীকার্য্য। কাজেই সমস্ত ঈশাধিকৃত হইলে ঈশা ব্যতীত পদার্থের স্থান কোথায় ? এজন্য আকাশবৎ আত্মা অখণ্ড, অসঙ্গ ও অচল। নিরবচ্ছিন্ন বলিয়া অখণ্ড ; দ্বিতীয়বিহীন বলিয়া অসঙ্গ এবং নিজের অতিরিক্ত স্থানাভাব হেতু অচল। এইটী ধারণা করিতে পারিলে প্রকৃত মানুষ হওয়া যায়। মানুষের বিশেষত্ব কি ? এই প্রশ্নের উত্তরে, অগ্নিপক্ক দ্রব্যাহার ও বস্ত্রাদি দ্বারা গাত্রাবরণ প্রথম লক্ষিত হয়। সমাজ, একতা সহানুভূতি, সঞ্চয় ও গৃহ নির্ম্মাণাদি অন্য প্রাণীতেও লক্ষিত হয়। এমন কি পরোপকার এবং প্রতিহিংসাও অন্য প্রাণীতে দেখা যায়। পদার্থবিদ্যা, শিল্প, কলা, প্রভৃতি শিক্ষা, বস্ত্রাদি নির্ম্মাণ, মনুষ্যত্বের বিকাশক এক অঙ্গ বটে ; কিন্তু উহা অতি হীন অঙ্গ। বিচাব দান, সন্তোষ, আস্তিক্য, সংযম ও সৎসঙ্গ এই সব মনুষ্যেব উচ্চাঙ্গীয় বিশেষত্ব। এই সকল দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হয়।

মোক্ষদ্বারে দ্বারপালা শ্চত্বারঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
শমো বিচার সন্তোষ চতুর্থ সাধুসঙ্গমঃ॥

(যো, বা, মু, প্র)।

অধ্যাত্ম-বিদ্যামন্দিরের মোক্ষদ্বারে চারিজন প্রহরী আছে। শম,

বিচার, সন্তোষ ও সাধুসঙ্গ। **শম**—মনের নিগ্রহ। এক ব্রহ্মই সৎ আর সকলই অসৎ, সৎএর গ্রহণ ও অসতের ত্যাগ, আত্মা নিত্য জগৎ-প্রপঞ্চ অনিত্য, এইরূপ যুক্তিমূলক প্রসঙ্গকে **বিচার** বলে। **সন্তোষ** যদৃচ্ছা লাভেই তুষ্টি, অর্থাৎ লাভ কিংবা লোকসানে কোন আপশোষ নাই। যাঁহার সৎবস্তু লাভ হইয়াছে তাঁহার সঙ্গ করাই সৎসঙ্গ বা **সাধুসঙ্গ**। সাধুর আব্‌হাওয়ায় বাস করিয়া, ত্যাগধর্ম্ম শিক্ষা করিতে হয়। সাধুদের বাক্য অবিচারিত ও অম্লান চিত্তে পালন করিতে হয়। নতুবা উহা ফলোপধায়ক হয় না।

শ্রীকৃষ্ণ দুর্ব্বাসা ঋষির সঙ্গ করিয়াছিলেন। ঋষিবরের যখনই যাহা অভিরুচি হইত তিনি অম্লান বদনে তাহা যোগাইতেন। একদিন গরম পায়স ভোগার্থ উপস্থিত করিলে, ঋষিবর উহা কৃষ্ণকে তাহার সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিতে বলিলেন। কৃষ্ণজী দ্বিধা না করিয়া স্বীয় গাত্রে ঐ গরম পায়স লেপন করিলেন। কোমলাঙ্গী রুক্মিনীদেবীকে প্রকাশ্য রাজপথে রথে জুড়িয়া কশাঘাত করিতে করিতে রথ টানিতে বাধ্যকরা অতিশয় নির্ম্মম হইলেও সর্ব্বংসহা ধরণীর ন্যায় অম্লানচিত্তে কৃষ্ণ তাহা সহ্য করিয়াছিলেন। উক্ত পায়স লেপনের ফলে কৃষ্ণের দেহ বজ্রসদৃশ হইয়াছিল। পদতলে পায়স না লেপন করায় তাহা কোমল ছিল এবং সেইস্থানে বাণ প্রবেশ করিয়া তাঁহার প্রাণত্যাগের কারণ হইয়াছিল।

মহারাজ হরিশ্চন্দ্র মৃগয়ায় যাইয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সঙ্গ করিয়াছিলেন ও তৎকর্ত্তৃক যাচিত হইয়া পৃথিবী দান করিয়াছিলেন। উক্ত দান-ক্রিয়ার স্বীকৃত দক্ষিণা দানার্থ অম্লানবদনে স্ত্রী, পুত্র, ও পরে আত্মদেহ বিক্রয় করিয়া চণ্ডালের কার্য্য পর্য্যন্ত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। সেই হেতু বৈদিকযুগের রাজা হরিশ্চন্দ্র এখনও স্মৃতিপটে জাগরিত আছেন।

(মুমুক্ষুর অধ্যবসায়)।

আমি অজ্ঞানাবরণে মুগ্ধ হইয়া আছি, এইটী যে বুঝিয়াছে এবং বুঝিয়া তাহার অপসারণের নিমিত্ত কৃতসংকল্প হইয়াছে সেই মুমুক্ষু। তাঁহাকে কি প্রকার উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হয় এ বিষয়ে বুদ্ধদেবের যে উক্তি আছে তাহা অতীব শ্রেষ্ঠ। যথা—

"ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে॥"

এই আসনে আমার শরীর শুকাইয়া যাক্; ত্বক্, অস্থি, মাংস, প্রলয় প্রাপ্ত হউক, তথাপি বহুকল্পে দুস্প্রাপ্য যে জ্ঞান তাহা লাভ না করিয়া এই আসন হইতে দেহ বিচলিত করিব না।

উপরোক্ত বিষয়ে এক চাষার গল্প আছে। ক্ষেত্রে জল না পাওয়ায় ফসল নষ্ট হইবার উপক্রম হইলে, এক চাষা নিকটবর্ত্তী নদী হইতে নালা কাটিয়া ক্ষেত্র পর্য্যন্ত জল আনয়ন জন্য মাটী কাটিতে আরম্ভ করিল। দুপ্রহরে আহারের সময় গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন না করায়, গৃহস্থ পত্নী ছোট পুত্রটীকে তাহাকে ডাকিতে পাঠাইলেন। কৃষক ঐ পুত্রটীকে বড় স্নেহ করিত। অন্যদিন হইলে সে পুত্রকে কোলে করিয়া কতই আদর করিতে করিতে গৃহে ফিরিত। কিন্তু আজ তাহার বুদ্ধি ক্ষেত্রের নালায় নিবদ্ধ। সে বলিল, পুত্র, গৃহে যাও, আমার দেরী আছে। ছেলে আব্দার করিলে, মৃত্তিকা খণ্ড দ্বারা তাহাকে তাড়না করিয়া নিজ কার্য্যে যোগ দিল।..পুত্রের মমতা আর নাই। অপরাহ্নে কৃষক পত্নী অধীরা হইয়া নিজে সেখানে আহার্য্য ও তামাক ইত্যাদি লইয়া গেল। তখনও নদীর জল নালায় আসার সামান্য বাকি। ঐটুকু শেষ করিলেই হইয়া

যায়। কৃষক পত্নী আদরে ও আবেগে কতই ডাকিল কিন্তু তাহার বাক্য কৃষকের কর্ণে প্রবেশ করিল না। তাহার মন তখন নদীর জলে আবদ্ধ। তৎপর সন্ধ্যার প্রাক্কালে যখন নালায় জল আসিতে আরম্ভ করিল তখন সে তীরে উঠিয়া তাহার স্ত্রীকে অপেক্ষা করিতে দেখিয়া বলিল, "আর কি—আগে তামাক আন।" কৃষকপত্নী তামাক দিলে সে তামাক টানিতে, টানিতে ক্ষেত্রে জল প্রবেশ দৃশ্য আনন্দে দেখিতে লাগিল ও পত্নীর সহিত কথোপকথন করিতে করিতে, কি পাক হইয়াছে, ছেলে খাইয়াছে কি না ইত্যাদি বহু প্রশ্ন করিল। মুমুক্ষু জীব এই প্রকার নির্ম্মম হইয়া, একাগ্রচিত্তে কাজ করিয়া ব্রহ্মলাভ করিবেন।

বিশ্বামিত্র রাজ্য, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া কত সাধনার ফলে মহর্ষিত্ব লাভ করেন।

"অনেকজন্মসংসিদ্ধ স্ততো যাতি পরাং গতিম্"

(গীতা ৬ষ্ঠ।৪৫)

অনেক জন্ম তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিলে পরমাগতি লাভ হয়। মহাপুরুষসংশ্রয়ের অর্থ—সংসারের যাবতীয় কার্য্য সমাধা করিয়া, অবসর মত একটু আধটু সৎসঙ্গ করা নয়। তাহাতে মহাপুরুষের সঙ্গ হয় বটে, কিন্তু নিষ্কপট নির্লোভ ভাবে সংশ্রয় করা হয় না। তন্, মন্, ধন্ সমস্ত শ্রীগুরুর চরণে অর্পণই সংশ্রয়। অর্থাৎ বিষয় কর্ম্ম ছাড়িয়া, অধ্যাত্ম বিদ্যালাভে প্রয়াসী হইয়া, সাধুর আব্হাওয়ায় বাস। কারণ, বিষয়কর্ম্ম-জনিত অবিদ্যা ও অধ্যাত্ম-বিদ্যা পরস্পর-বিরোধী। দুই নৌকায় পা দেওয়া চলে না। তবে অধ্যাত্ম-বিদ্যার চর্চ্চা করিয়া যদি সংসারধর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়, তবে ভক্তিমার্গে থাকা যায়। তাহাতেও সাধুসঙ্গ হয়। একেবারে না করার চেয়ে সময়ে সময়ে মহাপুরুষ সঙ্গ ও দানাদির দ্বারা উপকার হয়। উহাতে ক্রমে হৃদয় নির্ম্মল

হইতে থাকে, এবং ২।৪ জন্মের পর মোক্ষবুদ্ধি উপস্থিত হইতে পারে। ইহাও সৌভাগ্য।

"গৃহস্থো দিনে দিনে তু বেদান্তবিচারাদ্ ভক্তিসংযুতাদ্ গুরুশুশ্রূষয়া লব্ধাংকৃচ্ছাশীতি ফলং লভেৎ" ইতি উক্তম্ (আত্মানাত্মবিবেকঃ।৩)।

গৃহস্থ প্রতিদিন বেদান্ত শাস্ত্রাদির বিচার এবং ভক্তিসহকারে গুরুশুশ্রূষা করিলে, কৃচ্ছ্র প্রাজাপত্য ব্রতের অশিতিগুণ ফল লাভ করে। এজন্য আত্মানাত্ম বিচার অবশ্যই কর্ত্তব্য।

(স্ব-স্বরূপ-জ্ঞান—ছাগ বাঘার গল্প)।

সাধারণ সংসারী ও জ্ঞানীর ব্যবহার বিষয়ে, ছাগ ও বাঘের উপাখ্যান অতি উপাদেয়। এক গর্ভবতী বাঘিনী এক ছাগলের খোয়াড়ে আহার অন্বেষণে প্রবেশ করে। রাখালগণ তাড়া করায় ভয়ে লাফাইয়া পলায়ন কালে, বাঘিনীর প্রসব হইল। বাঘিনী ছানা ফেলিয়া পলাইল; রাখালগণ ঐ ব্যাঘ্রশিশুকে পালন করিতে লাগিল। ব্যাঘ্রশিশু ছাগলের দুধ খাইত। ছাগলের দলে থাকিয়া তাদৃক্ অনুকরণে ডাকিত ও চরিয়া বেড়াইত। ছাগলের দল দৌড়াইলে সেও দৌড়াইত। ঐ দলে থাকিয়া থাকিয়া তাহার সংস্কার এমনই হইয়াছিল যে, সে আপনাকে ছাগ বলিয়া বিশ্বাস করিত। কিছু দিন পরে এক বনের বাঘ ঐ ছাগলের দল আক্রমণ করিতে আসিলে ছাগগুলি দৌড়াইতে লাগিল। সেই ছাগবাঘও তাহাদের সঙ্গে, তাহাদের মত শব্দ করিতে করিতে, দৌড়াইল। উহাকে ঐরূপ শব্দ করিয়া দৌড়াইতে দেখিয়া, বনের ব্যাঘ্র, আশ্চর্য্যবোধে, নিজ আহারের চেষ্টা ত্যাগ করিয়া, ঐ ব্যাঘ্রশাবককে ধরিয়া লইয়া, এক জলাশয়ের ধারে উপস্থিত হইল। পরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কবিল, "তুই কেন ছাগশিশুর ন্যায় ব্যবহার করিস্?" শিশু উত্তর করিল, আমি ছাগ-শিশু। বনের বাঘ তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল, সে বাঘ, ছাগ নহে।

কিন্তু সংস্কারবশতঃ ব্যাঘ্রশিশু কিছুতেই ইহা বিশ্বাস করিতে পারিল না। তখন বনের বাঘ বলিল, জলের ধারে যাইয়া নিজের আকৃতি দেখ। ছাগবাঘ জলের নিকটে গিয়া নিজের আকৃতি দেখিতে লাগিল। বনের বাঘ প্রশ্ন করিল, 'তোর কাণ কেমন ? বাঘশিশু তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, 'ছাগলের মত লম্বা।' বাঘ বলিল, জলে প্রতিবিম্ব দেখিয়া উত্তর দাও। তখন বাঘশিশু দেখিল, তাহার কান ছাগলের ন্যায় লম্বা নহে। সে আশ্চর্য্যান্বিত হইল ও বলিল, তুমি আমার কান কামড়াইয়া লইয়াছ, তাই ছোট দেখাইতেছে। বাঘ বলিল, তোর কানে বেদনা আছে কি ? কিন্তু কানে বেদনা নাই দেখিয়া বুঝিতে পারিল বনের বাঘে তাহার কাণ কামড়াইয়া লয় নাই। এইরূপ ক্রমে নিজের ল্যাজ, মুখ, পা দেখিয়া সে অবাক হইয়া গেল। সে দেখিল, তাহার চেহারার সহিত ছাগলের চেহারার কোন সাদৃশ্য নাই, পরন্তু বনের বাঘের সহিত পুরা সাদৃশ্য বিদ্যমান রহিয়াছে। তখন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া, সে বুঝিতে পারিল, সে ছাগ নহে, সত্যই বাঘ। এইরূপে তাহার স্বস্বরূপ বুঝাইয়া দিয়া বনের বাঘ তাহাকে লাফাইতে, গর্জ্জন করিতে, মাংসাহার করিতে শিখাইল। ইহার পর একদিন ছাগবাঘ বনের বাঘকে সঙ্গে করিয়া সেই ছাগলের খোয়াড়ের নিকট উপস্থিত হইল। রাখালগণ তাহাকে দেখিয়া মনে করিল যে সে পথভ্রষ্ট হইয়াছিল, একজন নূতন সঙ্গীকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে। এই ভাবিয়া উভয়কেই খোঁয়াড়ে স্থান দিল। তাহারাও চুপ করিয়া শুইয়া রহিল এবং রাখাল শুইলে পর বহু ছাগ বধ করিয়া পলায়ন করিল। পথে বনের বাঘ ছাগবাঘকে বলিল, আর লোকালয়ে যাইও না। যাইলে, তোমাকে মারিয়া ফেলিবে। এক্ষণে তুমি বনের বাঘ। বাঘশিশু স্বরূপ বুঝিতে পারিয়া বনে প্রবেশ করিল। এস্থানে বাঘ—গুরু. ইন্দ্রিয়াদি—ছাগ ও জল—শাস্ত্র।

(সংসারী ও জ্ঞানী।)

সংসারী ও জ্ঞানীতে যে পার্থক্য তাহা নিম্নলিখিত উপাখ্যানে বেশ বুঝা যাইবে।

যে পিপীলিকার ঘোড়ার আস্তাবলের নিকট বাস সে ঘোড়ার লাদস্থিত ঘাসকণাদি খাইয়া জীবন ধারণ করে। তাহার মুখ ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানে ঘোড়ার লাদের দুর্গন্ধ রস শুকাইয়া লাগিয়া থাকে। একদা ঘোড়ার আস্তাবলবাসী একটী পিপীলিকা, তাহার আহার্য্য লাদের কণার খুব প্রশংসাদি করিয়া, মিশ্রির কারখানাবাসী, উপাদেয়, সুমিষ্ট, মিশ্রিখাদক পিপড়াকে নিমন্ত্রণ করিল। মিশ্রিখাদক পিপিলিকা নিমন্ত্রণে গেলে, তাহাকে অতি যত্নের সহিত কতক ঘোড়ার লাদার কণা খাইতে দিলে, সে দুর্গন্ধে তাহা মুখে দিতেই পারিল না। তৎপরে মিশ্রির কারখানাস্থ পিপীলিকা, তাহার খাদ্য মিশ্রিরসের বহু প্রশংসা করিয়া, ঘোড়ার আস্তাবলের পিপড়াকে পাল্টা নিমন্ত্রণ দিলে, সে আসিয়া প্রথমতঃ মিশ্রিরসের কোন আস্বাদই পাইল না। ইহাতে মিশ্রিখাদক পিপীলিকা আশ্চর্য্য হইয়া তাহার বন্ধুর দিকে চাহিয়া দেখিল যে, তাহার মুখে ও দাঁতের গোড়ায় ঘোড়ার লাদ লাগিয়া রহিয়াছে। তদ্দৃষ্টে মিশ্রিখাদক পিপড়া তাহাকে জলাদি দিয়া বলিল, "জী, ভাল করিয়া তোমার মুখ ও দাঁত ধুইয়া তারপরে খাও দেখি?" ঘোড়ারলাদের পিপড়া মুখ পরিষ্কার করিয়া যেই মিশ্রি খাইল অমনি বুঝিল যে বাস্তবিকই উহা অমৃত। সে যে এতদিন এই ন্যক্কারজনক লাদ খাইয়া জীবন কাটাইয়াছে, এমন অমৃতের সন্ধান পায় নাই, তজ্জন্য আক্ষেপ করিতে লাগিল। এইরূপ সংসারীর প্রথম প্রথম বেদান্ত পথে চলিতে মন সরে না। গুরুকৃপায় অন্তঃকরণ পরিষ্কার হইলেই বুঝিতে পারে যে সে কি নরকেই ডুবিয়া আছে।

জীব, ঈশ্বর ও ব্রহ্ম অভেদ, এইজ্ঞান দাস ভাবে হইতে পারে না। যে পর্য্যন্ত দ্বৈতের লেশমাত্র থাকে, ততক্ষণ আনন্দ-ঘন ব্রহ্মভাবই যে স্বকীয় প্রকৃত স্বরূপ, তাহা জানা যায় না, কাজেই, ব্রহ্মানন্দামৃত উপভোগই হয় না। যতক্ষণ পুস্তক পাঠ বা বাক্য শ্রবণাদি, ততক্ষণ দ্বৈত থাকেই। আবাঙ্‌মনস গোচরকে বাক্যদ্বারা চিন্তা করিলে দ্বৈত থাকিবেই। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন ঃ—

"ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি, ন বাগ্‌গচ্ছতি নো মনো" ইত্যাদি

যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥
যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনোমতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥"

(কেন, ১—৩।৪।৫)

অর্থ—সেথায় (ব্রহ্মবিষয়ে) চক্ষু যায় না, বাক্ যায় না, মনও যায় না, ইত্যাদি। যাহাকে বাক্যদ্বারা পৌঁছান যায় না, কিন্তু যে বাক্য প্রকাশ করে সে-ই ব্রহ্ম, তাঁকে জান, তাহা ব্রহ্ম নয় যাহাকে উপাসনা কর। যাহাকে মনদ্বারা পৌঁছান যায় না, কিন্তু যে মনকে সংকল্পাদির প্রেরণা দিয়া থাকে সে-ই ব্রহ্ম, তাঁকে জান। তাহা ব্রহ্ম নয় যাহাকে উপাসনা কর। ব্রহ্ম জ্ঞানসাধ্য নহে। নির্ম্মল চিত্তে স্বয়ংই প্রতিভাত হয়। অতএব চিত্ত নির্ম্মল করাই একমাত্র কর্ত্তব্য। চিত্তের বৃত্তি বহির্ম্মুখী; তাহার নিরোধই চিত্ত নির্ম্মলের সাধনা।

ষষ্ঠ বল্লী।

(ব্রহ্মের সূক্ষ্মতমত্ব।)

"সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং নিত্যং তৎ ত্বমেব ত্বমেব তৎ" (কৈবল্য ১।১৬)

পরমাত্মা পরব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপক হইলেও তাহা অতীব সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম বস্তু। উহার ধারণা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ দৃষ্টে অভ্যাস করিতে হয়। বর্ত্তমানকালে বিজ্ঞানবিদ্‌গণ যেমন সর্ব্বব্যাপী ও অদৃশ্য ঈশ্বর নামক পদার্থ স্বীকার করেন, তদ্বৎ ব্রহ্ম সূক্ষ্ম ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। বটবৃক্ষ অতি মহান্ ও স্থূল। যখন ঐ বট বীজে নিহিত থাকে তখন উহা কত সূক্ষ্ম। ক্ষুদ্র বটবীজ ভঙ্গ করিলে কিছুই দেখা যায় না; কিন্তু উহাতে মহান্ বট-বিটপী সূক্ষ্মভাবে নিহিত থাকে। বাতাস দেখা যায় না। সূক্ষ্ম পদার্থ কিন্তু স্পর্শ দ্বারা অনুভূত হয়। আকাশ পদার্থ আরও সূক্ষ্ম ও ব্যাপক। অন্তরে ও বাহিরে সর্ব্বত্রই আকাশ আছে। আত্মা ততোধিক সূক্ষ্ম ও ব্যাপক। সেইজন্য শ্রুতি লোকশিক্ষার্থ বলিয়াছেন "খং ব্রহ্ম" অর্থাৎ ব্রহ্ম 'খ' বা আকাশবৎ সূক্ষ্ম ও ব্যাপক মনে কর। মন বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি ব্রহ্মে পৌঁছিতে পারে না। তাই ব্রহ্ম সর্ব্বদাই তাহাদের অগ্রে উপস্থিত থাকেন. "তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ" (ঈশোপনিষৎ) এই সকল ইন্দ্রিয় ধাবমান হইলেও ব্রহ্ম সর্ব্বদাই পুরোভাগেই থাকেন। পরন্তু, উহাদের বহির্গমনশীলতারূপ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করাইয়া উপরত বা শান্ত করাইতে পারিলে, প্রশান্ত চিত্তে স্বয়ম্প্রভ ব্রহ্মের স্ফুরণ হয়। আমাদের দৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চ, পঞ্চমহাভূতে বিনির্ম্মিত। লয়কালে উহার পৃথ্বী তত্ত্ব

জলে লয় হয়, জল তেজে, তেজ বায়ুতে, বায়ু আকাশে এবং আকাশ প্রকৃতিতে লয় হয়। এইরূপ যাহা হইতে যদুৎপত্তি তাহার তাহাতে লয় হওয়ার দৃষ্টান্ত জল দ্বারা নিম্নে বিবৃত করা হইল। বরফ জলের স্থুলাবস্থা। এই বরফ যাহার আঘাতে, প্রথম জলযাত্রাতেই টিটেনাব নামক অভেদ্য বলিয়া গৌরবান্বিত জাহাজ মুহূর্ত্তে চুরমার হইয়া ইংলণ্ড ও আমেরিকার বহু উচ্চ পরিবারে শোকের বন্যা বহাইয়াছিল, তাহা অগ্নিতাপে তরল হইয়া জলাকারে পরিণত হয। যে জলের প্রবাহে ঐরাবত ভাসে, উহা এই বরফের গলিত তরল জলধারা। সেই জলকে তাপিত করিলে উহা অরূপ বাষ্পে পরিণত হয়। যে সূক্ষ্মরূপী বাষ্প মানবসমাজে "এন্‌জিন্" নামক যন্ত্র প্রবেশে বিরাট বিপ্লব আনয়ন করিয়াছে, সেই বাষ্পকে বৈদ্যুতিক তাপে সন্তাপিত করিলে তাহা তদপেক্ষা সূক্ষ্ম জলযান ও অম্লযান বাষ্পে পরিণত হয়। সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর বিদ্যুতের সৃষ্টি করিয়াই শক্তিহীন হন নাই। তদপি বায়ুকে সূক্ষ্মতম আকাশ পদার্থে পরিণত করিতে পারেন। ইহা অবিশ্বাস করিবার কোনই কারণ নাই। আবার সেই আকাশ পদার্থ অব্যক্তে লীন হয়; ইহাই প্রকৃতি-লয়াবস্থা। তৎপরে শক্তিযুক্ত অব্যক্তের বিনাশেই ব্রহ্ম জ্ঞান। ঋষিবাক্য একতানে বলিতেছে এক ব্রহ্মই আছেন, আর সকলই মিথ্যা। তাহাতে বিশ্বাস করিয়া চলিতে হয়। কারণ তাহারা ইন্দ্রিয়াতীত দর্শন দ্বারা লভ্য যে বস্তু তাহা লাভে কৃতকৃত্য ও অভ্রান্ত। তাঁহারা ব্রহ্মবিৎ ও ব্রহ্মই ছিলেন।

(বিশ্বাস ও বিচার।)

সদ্গুরু ও ব্রহ্মে কোনও প্রভেদ নাই। তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস করিতেই হইবে। সর্ব্বদা তাহাতে "কেন" বলিবে না। যখন মুমুক্ষু হইবে তখনই বিচারপথে যাইবে, নতুবা বিশ্বাসই সাথী জানিবে। তিনি যাহা বলেন তাহা অভ্রান্ত। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাঁহার আদেশ সমীচীন

বোধ হয় না, নাই হউক। নিজ বুদ্ধিতে অভিমান রাখিলে বিশ্বাস আসে না। বিশেষতঃ সদ্‌গুরু কোন কার্য্য নিজ প্রয়োজনে করেন না, অথবা কোন কর্ম্ম তাঁর প্রয়োজনে আসিতে পারে না। জ্ঞানদ্বারা কর্ম্ম ও তৎ-প্রয়োজন পুড়িয়া খাক্ হইয়া যায়। তাঁহাদের উপাসনাদি ধর্ম্মকার্য্য হইতে আহার বিহারাদি পর্য্যন্ত যে ব্যবহারিক সত্ত্বাব কাজ তাহা মুমুক্ষুর চক্ষে আত্মসদৃশ বোধ হইতে পারে, কিন্তু সেটা ভ্রান্তি। তাঁহাদের ঐ অবস্থার কর্ম্মফল স্তাবক ও নিন্দুকাদিতে বর্ত্তে। তাঁহাদের শরীরে রোগাদি হয় সত্য, কিন্তু মুমূর্ষুর ন্যায় তাঁহাদের শরীর ও জগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিস্মৃতি ঘটে। পরার্থে কর্ম্মানুষ্ঠানী যে দিব্যদর্শী ব্রহ্মবিৎ তাঁহার বাক্যে আস্থা স্থাপনে ভয় কি? শাস্ত্রাদি পাঠে ও গুরুবাক্যে বিশ্বাস করতঃ অগ্রসর হওয়া জিজ্ঞাসুর পক্ষে বড়ই উপকারক। যাহাতে বিশ্বাসের মূল সুদৃঢ় হয় তজ্জন্য অনুকূল যুক্তিদ্বারা উহার সমর্থন ও তদ্‌বিপরীত বিষয় ভ্রান্তিমূলক এইরূপ স্থির করিবে।

(দুর্ব্বাসা সদা উপাসা—গল্প।)

একদা মথুরার হাটবারে প্রবল বাত্যা হয়। তাহাতে খেয়ার নৌকা নিরুদ্দেশ হওয়ায় গোপীগণ হাটে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া যমুনা পার হওয়া নিয়া মহা বিপদে পড়িলেন। তৎপর তাঁহারা বিপন্নের সহায় শ্রীকৃষ্ণজীর সমীপে উপস্থিত হন। কৃষ্ণজী বলিলেন, তার জন্য কি? যাও, যমুনাজীকে যাইয়া বল যে, কৃষ্ণজী বাল ব্রহ্মচারী, তাঁর আজ্‌কার ব্রহ্মচর্য্যের পুণ্যফলে তুমি দু'ভাগ হইয়া রাস্তা দেও। দেখিবে, যমুনা ভাগ হইবে। তখন কোন কোন গোপীর মনে রাসলীলার কথা স্মরণ হইয়া কৃষ্ণজীর বাল্য ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে সন্দেহ বুদ্ধি আসিয়াছিল। কিন্তু তাহারা নিজ বিচার বুদ্ধিকে শাসন করিয়া বলিল, যখন কৃষ্ণ বলিয়াছেন, তখন তাঁহার কথা যমুনা মানিবেই। এই বিশ্বাসে তাহারা যমুনাতীরে উপস্থিত

হইয়া, ঐরূপ বলিবা মাত্র প্রবল-স্রোত-তরঙ্গ-সমন্বিতা যমুনা দুইভাগ হইয়া গোপীগণকে রাস্তা দিলেন। গোপীগণ সুখে নদী পার হইয়া মথুরা গমন করিলেন। ফিরিবার সময়ও যমুনাতীরে আসিয়া দেখেন যে, তখনও খেয়া পড়ে নাই। নৌকার নাম গন্ধ নাই। তখন তাঁহারা পুনরায় মহা বিপদ গণিলেন ও উপায়ান্তর না দেখিয়া কৃষ্ণজীর গুরু দুর্ব্বাসার কুটীরদ্বারে উপস্থিত হইলেন। দুর্ব্বাসা ঋষি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কোথা হইতে আসিতেছ? তাঁহারা বলিলেন, "মথুরার হাট করিয়া আসিলাম, এখন নদী পার হইতে চাই, কিন্তু খেয়া বন্ধ, যদি পারের সুযোগ করিয়া দেন। আসিবার কালেও খেয়া বন্ধ ছিল, তখন কৃষ্ণজী যমুনাকে ভাগ করিয়া রাস্তা দিয়াছিলেন। আপনি তাঁহার গুরু, আমাদের গুরুর গুরু, কৃপা করিয়া পার করিয়া দেন।" ঋষি বলিলেন, "আচ্ছা, সে এখন হবে, তোমাদের সঙ্গে কোন আহার্য্য আছে? তাঁহারা বলিলেন, "প্রচুর।" তখন ঋষি বলিলেন, যার নিকট যত আহার্য্য আছে বাহির কর, "আমি আহুতি দিব।" তখন গোপীগণ ঋষিবাক্যে সম্মত হইয়া, ছানা, মাখনাদি যার যা ছিল বাহির করিয়া দিলেন। ঋষি আহুতি দিবেন, যজ্ঞ হইবে, এর চেয়ে সুযোগ দানপক্ষে আর কি আছে? তাঁহারা ভাবিলেন, কি সৌভাগ্য আমাদের। তখন ঋষিজী কোন প্রজ্বলিত অগ্নিতে আহুতির অনুষ্ঠান না করিয়া, ঐ সকল অপরিমিত আহার্য্য গব্ গব্ করিয়া উদরস্থ করিলেন। তাঁহার আহারের পরিমাণ ও আহুতি দিব বলিয়া তাহা না দিয়া উহা খাইতে দেখিয়া, তাহারা অবাক্ হইয়া গেলেন। তাঁহাদের ক্ষুদ্র বিচার বুদ্ধি বলিল— "ঋষির এ কেমন ব্যবহার, কথার ঠিক নাই; আর এত একবারে আহার করা, সেই বা কেমন লোভ!" কিন্তু দুর্ব্বাসা কোপনস্বভাব বলিয়া কেহ কিছু বলিতে সাহস করিল না। ভাবিল, আচ্ছা, 'ছলে থাক

বলে থাক্," ব্রাহ্মণে থাক্। ব্রাহ্মণসাৎ হইয়াছে এই যথেষ্ট। আহুতি না দিয়াছে, নাই দিল। ঋষি আহারান্তে উঠিয়া খুব এক উদ্গারের ন্যায় শব্দ করতঃ বলিলেন, যা, যজ্ঞ হইযাছে। যমুনাকে যাইয়া বল যে, "দুর্ব্বাসা সদা উপাসা, তিনি আজ যে উপবাস করিযাছেন সেই ফলে দুভাগ হও।" শুনিবামাত্র সব গোপীর মনে বিচার বুদ্ধিতে একই কথা বলিল যে, বলে কি ? এইমাত্র গর্ গর্ করিয়া শতাধিক লোকের আহার্য্য খাওয়া, আর মুখ মুছিয়াই বলে যে, যাও, বলগে 'দুর্ব্বাসা সদা উপাসা'। কিন্তু ঋষির স্বভাব কোপন জানিয়া কেহ কোনও বাঙ্নিষ্পত্তি করিতে সাহস করিল না। যমুনার পারে আসিতে আসিতে রাস্তায় ঐ সম্বন্ধে কথা উঠিল। একজন বৃদ্ধা বলিল, ঋষি বড ভারি, তাঁর কথা পৃথিবীতে কে আছে যে না শুনিবে ? না শুনিলে, মুনি কি তাহাকে ভস্ম না করিয়া রাখিবে ? তাঁর কথাই কথা। তোমাদের বুদ্ধি সুদ্ধি কিছু নয়। চল, ঋষিবাক্যে অবহেলা করিও না। এই কথা শুনিয়া সকলেই ভাবিল, তাইত, আমরা বা কি ! চাষা, মূর্খা, বনবাসী গোপনারী বইত নই ? আর, ঋষি কত বড দেবতা ! তাঁর রকম, সকম, ব্যবহারও কথাবার্ত্তার আমরা কি বুঝি ? তিনি যখন বলিযাছেন যে, উপবাস-ফলে নদী ভাগ হবে, তখন নদী ভাগ হবেই হবে। ঋষি দেবতা, তাঁর কথাই ঠিক, আমাদেরই বুঝিবার ভুল। এই নিশ্চয়ে, সকলে যমুনাকে বলিল, "দুর্ব্বাসা সদা উপাসা," তিনি আজ যে উপবাস করিয়াছেন তার ফলে তুমি দুভাগ হও, আমরা পার হইব। নদী তৎক্ষণাৎ দুই ভাগ হইল। তাহারা পার হইয়া নিরাপদে গৃহে আসিতে আসিতে পুনরায় আলোচনা করিল,—এ যে তাজ্জব ব্যাপার ! ঋষির উপবাসফলের কথা বলিবামাত্র অমনি প্রবল-স্রোতা, ভীষণ তরঙ্গিনী যমুনা রাস্তা দিল। তবে ত ঋষি-বাক্যই সত্য, এত ছানা, মাখন উদরস্থ করিল, তাতেও উপবাসই রহিল !

তাহারা চিন্তা করিয়া কূল না পাইয়া ভাবিল, দূর হউক, আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধি, আমরা কি বুঝি; ঋষিদের ব্যবহার স্বতন্ত্র। তাঁহাদের বাহিরের ব্যবহার দিয়া কিছু বুঝা যায় না। তখন কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া চারিজন যুবতী, যাদের মনে কৃষ্ণের বাল্য ব্রহ্মচারিত্ব সম্বন্ধেও খট্‌কা লাগিয়াছিল, ভাবিল, একথা কৃষ্ণজীই বুঝাইয়া দিতে পারিবে। চল, তার কাছে যাইয়া জিজ্ঞাসা করি। তখন তাহারা কৃষ্ণজীকে নির্জ্জনে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—ভাল, কৃষ্ণজী, তুমি আমাদের সমস্ত বিপদ আপদে রক্ষা কর, একটা কথা আমাদিগকে বুঝাইয়া দাও। কৃষ্ণজী সম্মত হইলে, তাহারা বলিল, তোমার বাল্য ব্রহ্মচারিত্ব সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস আসে নাই। তুমি আমাদের সঙ্গে রাসলীলা করিয়া থাক। তবে কিরূপে তোমার ব্রহ্মচর্য্য অটুট আছে, এইটী বুঝি নাই। কৃপা করিয়া আমাদিগকে বুঝাইয়া দাও। আমরা অজ্ঞ, তোমারই আশ্রিতা। তখন কৃষ্ণজী বলিলেন যে, আমি স্বয়ং ভগবান, যোগমায়া অবলম্বনে আছি। আমি অচ্যুত, আমার কোনও চ্যুতি নাই। রাসলীলাতে ষোল হাজার গোপী সহ, ষোল হাজার কৃষ্ণরূপেই যে বিহার করি, তাহা লীলা মাত্র। তাহাতে তোমাদের কামনা পূরে, কিন্তু আমার কোনও কামনা নাই, কাজেই ব্রহ্মচর্য্যেরও হানি নাই। তাহারা কৃষ্ণ যে পূর্ণব্রহ্ম তাহা পূর্ব্বেই কতক হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল। যোগমায়ায় সময় সময় বিস্মৃত হইত মাত্র। তাহারা পুনরায় প্রশ্ন করিল, আর একটা কথা,—তোমার পুণ্যফলে আমরা যমুনা পার হইয়া গেলাম; মনে করিয়াছিলাম যে ফিরিবার কালে খেয়া পাওয়া যাইবেই। তাই পুনঃ পারের ব্যবস্থা জন্য তোমাকে কিছু বলি নাই। হাট হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখি যে, যমুনা তেমনি প্রবলা, খেয়া পড়ে নাই। তখন নিরুপায় হইয়া, তোমার গুরু দুর্ব্বাসার শরণ লইলাম। তিনি বলিলেন, আচ্ছা, পারে যাবি, তা ত হবে; তোদের

সঙ্গে কি আহার্য্য আছে আন; আহুতি দিব। আমরা ভাবিলাম, ঋষি যজ্ঞে আহুতি দিবে, খুব ভাল কথা। যার যত ছানা, মাখন, ঘৃতাদি ছিল সব তাঁহার সম্মুখে রাখিলাম। মনে করিলাম যে, তাঁর যতটা দরকার তা তিনি নিবেন। কিন্তু তিনি করিলেন কি? যজ্ঞও না কিছুই না, অগ্নিও নাই, গর্ গর্ করিয়া সমস্ত খাইয়া ফেলিলেন! এত জিনিষ একজনে একবারে খাইতে পারে তা আমরা ধারণাই করিতে পারি নাই। রাক্ষসেও এত খাইতে পারে না। শত, শত ভার জিনিস একেবারে খাইয়া ফেলিয়া, আচমন করিয়া বলিলেন,—যা, তোরা যমুনার কাছে গিয়া বল, 'যমুনে! দুভাগ হও, দুর্ব্বাসা সদা উপাসা, তার আজকার উপবাসের পুণ্যফলে আমরা পার হইব।' আমরা ত কথা শুনিয়া অবাক্! রাক্ষসের মত এই খাইয়া উঠিতে না উঠিতেই এমন কথা বলা, 'উপাস আছি,' আর সেই পুণ্যফলে পার হওয়া। এত বড় মুনি, আমরা সামান্যা গোপী। তখন মনকে বুঝাই, যা হউক তা হউক। ঋষি যখন বলিয়াছে তখন যমুনা ভাগ হবেই, নতুবা মুনি অনর্থ ঘটাইবে। আমরা এই বিশ্বাসে যেই বলা, 'যমুনা ভাগ হও,' অমনি নদী দুই ভাগ হইল। এই উপবাস কেমনে হইল? আমাদের কাহারও বুদ্ধিতে এইটী আইসে না। কৃষ্ণজী বলিলেন,—দেখ, দেবতাদের অর্চ্চনা ও আহুতি অগ্নিতে দিতে হয়। দেবতারা অগ্নিমুখ। অগ্নিতে যে দেবতার উদ্দেশে যে আহার্য্য বা আহুতি দেওয়া যায় তাহা সেই দেবতা তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করেন। প্রাণিদেহে জঠরাগ্নি নামে বৈশ্বানর অগ্নি আছেন।

"অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্॥"

গীতা ১৫ অধ্যায় ১৪ শ্লোক।

আমি বৈশ্বানর অগ্নিরূপে প্রাণীগণের দেহ আশ্রয় করিয়া অবস্থান

করতঃ, প্রাণও অপানাদি বায়ুর সাহায্যে, চব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয় এই চতুর্ব্বিধ অন্ন পচন কবি। এস্থলে, নিরগ্নি মুনি অন্য অগ্নির অভাবে সেই জঠরাগ্নিতেই হোম করিলেন। তোমাদের প্রদত্ত জিনিষ সবই ঐ হোম-কায্য দ্বারা দেবার্পিত হইল। উহার এক বিন্দুও তাঁহার নিজ দেহ পোষণার্থ গ্রহণ না করায় তাঁহাব উপবাস অটুট। দেবগণ অগ্নি-মুখ, অগ্নিতে যে আহুতি যে দেবতার উদ্দেশে প্রদত্ত হয়, সেই আহুতি তাঁহাকেই পৌঁছায়। এ ক্ষেত্রেও ঋষি প্রদত্ত আহুতি সর্ব্বদেব কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে। এইরূপ জঠরাগ্নিতে আহুতি প্রদান অসাধারণ ব্যাপার। সাধারণ লোকের পক্ষে এইটী যথার্থ ধারণা করা কঠিন হইযা পড়ে।

আমরা যেমন গৃহে বা বথে অবস্থান কবি, আত্মাও তদ্রূপ দেহরূপ দেবালয়ে বা রথে বাস করেন।

"দেহো দেবালয়ঃ প্রোক্তঃ স জীবঃ কেবলঃ শিবঃ"

ইতি (মৈত্রেয উপনিষৎ ২।১)

"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু"

(কঠ, ৩।৩)

দেহ দেবালয। তাহাতে ও যজ্ঞবেদীতে পার্থক্য কোথায়? যে দেবতা সর্ব্বত্র ও সর্ব্বভূতে আছেন, তিনি রক্ত মাংসময় দেহেতেও আছেন তাঁহার সুস্থান কুস্থান নাই। তাহাতে তন্ময় হওয়াতেই আত্মার তৃপ্তি। ভাগবতে শিশুপাল ও কংসাদি অনুরাগের পথে না গেলেও তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন বর্ণিত আছে। এবং উক্ত গ্রন্থে প্রেমাপেক্ষাও শত্রুভাব শীঘ্র কার্য্যকরী বলিয়া উল্লিখিত আছে।

"বৈরানুবন্ধেন মর্ত্ত্যস্তন্ময়তামিয়াৎ।

ন তথা ভক্তিযোগেন ইতি যে নিশ্চিতা মতিঃ॥"

(ভাগবত ৭।১।২৬)

ভগবানে বৈরভাব দ্বারা যত শীঘ্র তন্ময়তা প্রাপ্ত হওয়া যায়, ভক্তি দ্বারা তদ্রূপ হয় না, ইহাই আমার (নারদের) দৃঢ় বিশ্বাস। চিত্তের অবস্থার প্রতি ভগবৎদৃষ্টি। দুর্ব্বাসা ব্রহ্মবিৎ ঋষি। পরা ভক্তি জ্ঞানীতেই সম্ভবে।

"তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তি বিশিষ্যতে"

(গীতা ৭।১৭)

(ব্রহ্মজ্ঞ ভোক্তা হন না।)

যাহার ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগ ভাবের অভাব হইয়াছে, এইরূপ অবস্থায় তিনি আহার করেন কি করিয়া ?

"ত্রিষু ধামসু যদ্ভোগ্যং ভোক্তা ভোগশ্চ যদ্ভবেৎ।
তেভ্যো বিলক্ষণঃ সাক্ষী চিন্মাত্রোঽহং সদাশিবঃ॥"

(কৈবল্যোপনিষৎ ১৮)

অর্থাৎ—স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও অন্তরীক্ষ লোকে যে ভোগ্য, ভোক্তা বা ভোগ আছে, তিনি তাহা হইতে পৃথক বা সাক্ষী মাত্র। চিৎ-ময়, সদাশিব-রূপী 'অহমস্মি' ভাবে অবস্থিত। এরূপ ভাবে স্থিত ঋষির ভোজন হয় কিসে ? প্রাণী মাত্রই অহং বা 'আমি আছি' এইরূপ জ্ঞানযুক্ত। দুই ব্যক্তি কলহ করিতেছে। নিরপেক্ষ দ্রষ্টা সাক্ষী। তাহার সহিত কলহের কোন সম্বন্ধ নাই। শরীর রক্ষার্থ যাহা গৃহীত হয় তাহার ভোক্তা কে ? ইহা অতি সূক্ষ্ম বিচারের কথা। পূর্ব্ব বর্ণিত 'আমি' মোটা অহংকার বেষ্টিত 'আমি' হইতে পৃথক। মোটা অহংকার বেষ্টিত লিঙ্গ ও স্থূল দেহাভিমানী ভোক্তা। আমি পদ বাচ্য বুদ্ধিরূপ দর্পণে প্রতি-বিম্বিত চিৎ ও কূটস্থ আত্মা নিয়ন্ত্রিত হইয়া প্রাণীগণের কার্য্য সমাধা হয়। মহাকাশে ঘটাকাশবৎ, অর্থাৎ ঘটের অবয়ব ব্যাপী আকাশবৎ, প্রতি অবয়ব ব্যাপী আত্মা কূটস্থ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। ঘট নড়িলেও যেমন ঘটাকাশের পরিবর্ত্তন নাই, তেমনি কূটস্থেরও কোন পরিবর্ত্তন নাই।

কূটস্থ অবিকারী। কূট শব্দের অর্থ অচল পর্ব্বতশিখর বা কামার শালের 'নেয়াই' (যে বৃহদায়তন লৌহখণ্ডের উপর ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি অস্ত্রাদি কুটিত পিটীত হইয়া নির্ম্মিত হয়)। নেযাইয়ের উপর নানা প্রকার অস্ত্র, শস্ত্র আদি নির্ম্মাণ রূপ নানাপ্রকার বৈকারিক কায্য সম্পন্ন হইলেও নেযাইয়ের কোনও পরিবর্ত্তন হয়না। তদ্রূপ, প্রত্যাগাত্মা কূটস্থ ; কারণ, সূক্ষ্ম, স্থূল শরীরত্রয়েব অবিরত পরিবর্ত্তনের মধ্যে চির অবিকারী ও অপরিবর্ত্তনীয়। অবিকারী কূটস্থ নিষ্ক্রিয় , ভোক্তা নহেন। চিৎ-প্রতিবিম্ব প্রতিবিম্ব মাত্র। প্রতিবিম্ব ভোক্তা হয়না। বুদ্ধি জড়, ভোক্তা হযনা। এইরূপ সূক্ষ্ম বিচার করিলে, ভোক্তার একান্ত অভাব। ব্যবহারিক সত্তায, লিঙ্গ শরীরাভিমানী ভোক্তা। মহর্ষির লিঙ্গ শরীরাভিমান না থাকায, ভোগাভাব। সেইজন্য 'সদা উপবাসা'।

দুর্ব্বাসা মুনির গোপীগণের প্রতি ব্যবহারের ন্যায়, জ্ঞানীগণেব ব্যবহার অজ্ঞানীর পক্ষে সর্ব্বদা বুঝিয়া উঠা কঠিন। তাঁহাদের আদেশ ও উপদেশ অবহিত চিত্তে মানিয়া লওয়াই যুক্তিযুক্ত। তাঁহারা যাহা বলেন তাহা উপকারার্থই হইবে, বিশ্বাস করিলে, সাধুসঙ্গের সম্যক্ ফল লাভ হয়।

(সাধুর আবহাওয়ার ফল।)

এক রাজার এক ষোড়শ বর্ষীয়া বিধবা কন্য', নিকটবর্ত্তী এক সাধুর আশ্রমে পিতার সহিত সময় সময় যাইত। সাধুর রূপে ঐ কন্যা মুগ্ধ হইয়া, একদা পিতৃপুরীত্যাগে সাধুর নিকট উপস্থিত হইয়া, স্বীয় মনন জ্ঞাপন করিলে, সাধু বলিলেন, "পরিবার হয়ে থাক্ তবে থাক্"। সে তাহাতে সম্মতা হইলে, সাধু তাহাকে নিজের সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম—(পাক করা, কাপড় কাচা, মোট বহা ইত্যাদি) করিতে দিলেন ও তিনি বাহিরে

শুইলে নিজের পা টিপাইতেন। ঐ সাধুর আশ্রমে যাতাযাতকারী লোকমুখে ক্রমে ঐ সংবাদ রাজার কর্ণগোচর হইল। সাধুকে অতি বদ্‌লোক মনে করিয়া তাহাকে শাস্তি দিবার জন্য, রাজা সাধুর আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। সাধু তখন বাহিরে এক খাটিয়ায় শুইয়া শিষ্যগণকে পড়াইতে ছিলেন। তৎপার্শ্বে বসিয়া রাজকন্যা তাঁহার পদসেবা করিতে ছিলেন। কন্যা পিতাকে দেখিয়া উঠিতে উদ্যত হইলে, সাধু তাহাকে পদসেবা কর্‌তে রহ বলিয়া পড়াইতে মনোনিবেশ করিলেন। রাজা আসিয়া কন্যাকে ঐ ভাবে দেখিয়া ক্রোধে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে অক্ষম হইয়া, সাধুর শিরোদেশে দণ্ডায়মান হইলেন। কিন্তু সাধুর ভ্রূক্ষেপ নাই। তখন, সাধু তাঁহার পাদুকা ও অস্ত্রাদির শব্দ শুনিতে পায় নাই মনে করিয়া, রাজা সজোরে পদবিক্ষেপ করিয়া, সাধুর পদসংবাহনকারিণী কন্যার নিকটবর্ত্তী হইলেন। তথাপি সাধুর ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি শিষ্যদিগকে যে ভাবে পড়াইতেছিলেন, সেই ভাবেই অধ্যাপনায় নিযুক্ত রহিলেন। রাজা সাধুর ঈদৃশ ব্যবহারে চমৎকৃত হইলেন। কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পদচারণ করিয়াও সাধুর কোন বিক্ষেপ লক্ষ্য করিলেন না। তখন তারস্বরে বলিলেন, "মহাশয়! এ কেমন সাধুতা যুবতী-পরতন্ত্র হইয়া একেবারে কাণ্ডজ্ঞানবিরহিত দেখিতেছি। যাহার কন্যার প্রতি এই ব্যবহার, তাহার উপস্থিতিতেও ভোগসুখে বিরতি নাই। সাধু বলিলেন, তিনি কোন যুবতী উপভোগে রত হন নাই। শিষ্যগণের শিক্ষায় নিযুক্ত আছেন। যে যুবতী তাঁহার সেবা করিতেছে; সেই শিষ্যারও তিনি সেবা গ্রহণ করিয়া, তাঁহার চিত্তবিক্ষেপ দূর করিতেছেন। হে রাজন্‌! তোমার ক্রোধের কোন কারণ নাই। স্থিতধী, প্রশান্ত, গম্ভীর সাধুর বাক্যে রাজার মনে প্রবোধ হইলেও, তিনি নিঃসংশয়ার্থ জিজ্ঞাসিলেন যে, এই যুবতী সহ তাহার কি সম্বন্ধ। সাধু বলিলেন, এই

কন্যা যখন অন্ন প্রদান করেন তখন মাতা, যখন বস্ত্র ধৌত করেন তখন ধুবি, যখন মোট বহেন তখন মুটিয়া, যখন পা টিপেন তখন দাসী ও কন্যা, যখন পড়েন তখন শিষ্যা, পাপ সম্পর্ক ব্যতীত এইরূপ বহু সম্বন্ধ চলিতেছে। রাজা সাধুর অবিচলিত ভাব ও স্থৈর্য্যদর্শনে অবাক্ হইয়া গেলেন ও সেই সরল মধুর বাণীতে তাঁহার ক্রোধের উপশম হইলে, সাষ্টাঙ্গ প্রণামান্তর বলিলেন 'মহারাজ! আজ আমি সত্য বাক্য শ্রবণ ও সত্যভাষীর দর্শন পাইলাম। যাঁহার রাজ্যে এই প্রকার সাধু বাস করেন, সেই ধন্য। আপনার সংসর্গে আমার কন্যা সৎপথে শমতা প্রাপ্ত হইয়াছে। কারণ, আপনার ন্যায় এই আমার কন্যাতেও আমি পাপ-বিদ্বেষ ন্যায় কোন বৈলক্ষণ্যই দেখিলাম না। অসৎ পথাবলম্বী হইলে এইরূপ হয় না। সাধুর সঙ্গ লাভে এইরূপই পরিবর্ত্তন হয়। যেমন চন্দন সংসর্গে অন্য বৃক্ষও চন্দনত্ব প্রাপ্ত হয়, যেমন ড্রেনের জল গঙ্গায় পতিত হইলে, গঙ্গাত্বই প্রাপ্ত হয়; সেইরূপ সাধু মহাপুরুষেরও গঙ্গা বা বৃক্ষাদির ন্যায় পরোপকার ব্রত। এতৎ সম্বন্ধে বহু লোকই ভ্রান্ত মত পোষণ করে। বৃক্ষ—ফল, মূল, পত্রাদি ও ছায়া প্রদান করিয়া থাকে, তৎপরিবর্ত্তে কিছুই চায় না। গঙ্গা—সর্ব্বপাপ হরণ করেন, পিপাসার শান্তি করেন, ধরাকে শস্যশ্যামলা করেন; কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে কিছুই চাহেন না। এইরূপই সাধুর চরিত্র জানিবে।

সপ্তম বল্লী।

(আমি ও আমার।)

আত্মবিদ্যা বিষয়ক বিচারের প্রথম অবতারণার সময় যখন শোনা যায় যে স্থূল, সূক্ষ্ম কিংবা কারণ শরীর আমার ; কিন্তু আমি নহে, তখন ছাগ-বাঘার ন্যায় নিজের স্বরূপে বিশ্বাস হয় না। যেমন গৃহ, আসবাবাদি আমার ; কিন্তু আমি হইতে ভিন্ন , তদ্বৎ ইন্দ্রিয়গণও আমার, আমি নহে, তাহাতে আত্মবুদ্ধি অর্থাৎ অহং বুদ্ধি ভ্রান্তি মাত্র।

"নাহং ভূতগণো দেহো নাহং চাক্ষগণস্তথা।
এতদ্ বিলক্ষণঃ কশ্চিদ্‌বিচারঃ সোহয়মীদৃশঃ॥"

(অপরোক্ষানুভূতি ১৩)

আমি পঞ্চভূত, দেহ বা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় নহি। এই সব হইতে পৃথক একটা কিছু। ইহাই বিচারের বিষয়।

"নাহং দেহো নেন্দ্রিরাণ্যন্তরঙ্গং
নাহঙ্কারঃ প্রাণবর্গো ন বুদ্ধিঃ।
দারাপত্য ক্ষেত্রবিত্তাদি দূরঃ
সাক্ষী নিত্যঃ প্রত্যগাত্মা শিবোহহম্॥"

(আত্মপঞ্চক ১)

আমি দেহ, ইন্দ্রিয়, অহঙ্কার, প্রাণবর্গ কিংবা বুদ্ধি নহি। স্ত্রী, পুত্র, ক্ষেত্র ও বিত্ত ত দূরের কথা। আমি প্রত্যগাত্মা নিত্য সাক্ষী শিব।

এই আমি তবে কি ? তদুত্তরে দেখ, যদি ডাক্তার তোমার পা বা হাত কোন রোগ নির্ম্মুক্ত করার জন্য কাটিয়া ফেলেন তখন দেহের স্বল্পতা ঘটিলেও আমিত্বের স্বল্পতা হয় না। যথা—যে আমি, বাল্যে পাঠশালায় কলিকাতার গল্প শুনিয়াছিলাম সেই আমি কলেজের পাঠ কলিকাতায় সমাপন করিয়া, আজ তোমাকে বৃদ্ধ বয়সে তৎকালিক কলিকাতার অবস্থা বলিতেছি। এস্থলে ৪।৫ বৎসরের শিশু দেহে, পূর্ণ যৌবনে ও ৬০ বৎসরের বৃদ্ধ শরীরে, আমি একই আমি, অথচ শারীরিক ও মানসিক কতই পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল। লোকে প্রাণ বাঁচাইবার জন্য স্ত্রী, পুত্র, ধন এমন কি নিজ হস্তপদাদিও ত্যাগ করিতে চায়, তবু প্রাণ থাকুক। সুদীর্ঘকাল রোগে দেহ জীর্ণ হইলে বা কুষ্ঠাদি হইলে যখন জীবনে ধিক্কার উপস্থিত হয়, তখন অনেকেই বলে, "এখন প্রাণ গেলেই বাঁচি।" এই যে বস্তু প্রাণ গেলে বাঁচে, সেই আত্মা, সেই আমি।

সর্ব্ব নরনারীতে, সর্ব্ব প্রাণীতেই একটা আমিত্ব আছে। এই সব আমি একই অখণ্ড আমি। যেমন ঘটে, পটে, মঠে একই আকাশ। অখণ্ড আকাশে পরিচ্ছিন্নতা কল্পিত হয় মাত্র। তদ্বৎ, আমি পদার্থও অখণ্ড, এক, অদ্বিতীয়। ঘটে ঘটে আত্মার পরিচ্ছিন্নতা কল্পিত। পৃথকত্ব অবিচারশীলতার পরিচায়ক বটে।

"অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্"

(গীতা ১৩।১৬)

এক অবিভক্ত আত্মাই ভূতে ভূতে বিভক্তবৎ প্রতীয়মান হয়।

"অবিভক্তংবিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকং"। (গীতা ১৮।২০)

ভূতে, ভূতে বিভক্ত মধ্যে, অবিভক্ত এক অখণ্ড আত্মার দর্শন সাত্ত্বিক জ্ঞানের লক্ষণ।

"যদাভূত পৃথগ্ ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।

তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা॥" গীতা ১৩।৩০

যখন সাধক ভূত সকলের পৃথক্ পৃথক্ ভাব সত্ত্বেও এক আত্মাতে স্থিত দেখে ও তাহাতেই জগতের বিস্তার জানে, তখনই তাঁর ব্রহ্ম লাভ ঘটে।

"ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য ধীরাঃ।

প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি॥"

(কেনোপনিষৎ ২।৫)

ধীর ব্যক্তি, ভূতে ভূতে সেই অখণ্ডকেই চিন্তন করিয়া, দেহত্যাগে অমরত্ব (ব্রহ্মত্ব) লাভ করে।

"অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো

রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।

একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা

রূপং রূপং প্রতিরূপং বহিশ্চ॥"

(কঠশ্রুতি ২।২।৯)

একই অগ্নি যেমন ভূলোকে অগ্নি; অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎ, গ্রহ, চন্দ্রমা। দ্যৌ লোকে সূর্য্য, নক্ষত্রাদি রূপে দৃষ্ট হয়, তেমনি একই আত্মা সর্ব্বভূতের অন্তরে আছেন এবং পৃথক্, পৃথক্ বলিয়া বিচারহীনের নিকট প্রতীয়মান হন।

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি

সংপশ্যন্ ব্রহ্ম পরমং যান্তি নান্যেন হেতুনা।"

(কৈবল্য উপনিষৎ ১০)

সর্ব্বভূতে আমি আছি ও সর্ব্বভূত আমাতে অবস্থিত দর্শনেই ব্রহ্ম লাভ হয়। তৎ ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

"যস্তু সর্ব্বানিভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্ব ভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে ॥"

(ঈশোপনিষৎ ৬)

যিনি সর্ব্বভূত আপনাতে ও সর্ব্বভূতে আপনাকে দেখেন, তাঁহার ঘৃণা ও লজ্জাদি বৃত্তি মাত্রের একান্ত অভাব হয়।

(স্ব-রূপ।)

তোমার এই দৃশ্যমান জগৎ, আত্মীয়স্বজন, জন্মমৃত্যু সবই ভ্রান্তি। তুমি সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপ, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত। তোমার জন্ম, মৃত্যু নাই। তুমি অজর, অসঙ্গ, অখণ্ড, আত্মা। সদ্গুরু এইরূপে শিষ্যকে আত্ম-প্রবোধ দ্বারা, স্ব স্বরূপে স্থাপন করিয়া থাকেন। তখন, 'ছাগ-বাঘের' ন্যায় ঐ কথা ধারণা করা দূরের কথা, অত্যাশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয়। বেদান্ত শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া, পরোক্ষজ্ঞান ও গুরুকৃপায় অপরোক্ষানুভূতি হইলে, বুঝিতে পারিবে যে কি অজ্ঞান তিমিরেই ডুবিয়া ছিলে। বাঘ যেমন ছাগ বধ করিয়া খোয়াড় হইতে বাহির হইয়াছিল, দেহরূপী খোয়াড় হইতেও সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণকে বধ করিয়া বাহির হইলে আত্মবিদ্যা লাভ হয়।

"আবৃত্ত চক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্" অমৃতত্ব লাভার্থ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় আবৃত করিতে হয়—কূর্ম্মবৎ। সাধনপঞ্চকে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—"নিজগৃহাৎ তূর্ণং বিনির্গম্যতাম্" দেহরূপ গৃহ হইতে শীঘ্র বাহির হও এবং নিজ স্বরূপ অববোধ কর। নিজকে পরিচ্ছিন্ন মনে করিও না। তথাচ,—

"বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভুব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥"

(কঠোপনিষৎ—২।১০)

একই বায়ু যেমন ভুবন বেষ্টিত হইয়াও কখন মৃদু, কখন প্রবল, কখনও ঝড়রূপে, কখন শীত, কখন উষ্ণরূপে, পৃথক্ বলিয়া প্রতীত হয়, সেইরূপ সর্ব্বভূতের অন্তরে ও বাহিরে একই আত্মা প্রতি প্রাণীতে বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয়েন। যেমন সূর্য্য সর্ব্বত্র সমান তেজ দান করেন, অর্থাৎ সর্ব্বভূতেই সামান্য, কিন্তু দর্পণাদিতে সৌর তেজ পতিত হইলে, তাহা বিশেষ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, এবং কাঁচ বিশেষে, বিশেষ ক্রিয়াশীল হয়, (অর্থাৎ কোথাও সপ্তবর্ণে বিভক্ত দেখায়, কোথাও বা কাঁচের কেন্দ্রে সমবেত রশ্মি দহন কার্য্য সম্পাদন করে।) তদ্বৎ সামান্য আত্মা সর্ব্বব্যাপী। আত্মা, বুদ্ধিরূপ দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া, নানারূপ বুদ্ধির তারতম্যে, পৃথক্ পৃথক্ ক্রিয়াশীল জীবের সৃষ্টি করেন এবং অখণ্ড হইয়াও খণ্ড বা বিশেষরূপে প্রতিভাত হন।

(সদ্‌গুরু প্রশংসা।)

সদ্‌গুরু উপরোক্তরূপে একত্বানুভব করাইয়াই আনন্দরসে আপ্লুত হন।

"অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ১
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকযা।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ২
অখণ্ডানন্দবোধায় শিষ্যসন্তাপহারিণে।
সচ্চিদানন্দরূপায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৩
সর্ব্বশ্রুতিশিরোরত্ন বিরাজিতপাদাম্বুজম্।
বেদান্তাম্বুজ মার্ত্তণ্ডং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৪

যাঁহার দ্বারা এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক মণ্ডলাকার বিশ্ব অখণ্ড ভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছে, তাঁহার পদ-প্রদর্শক গুরুদেবকে নমস্কার। ১

জ্ঞানরূপিণী শলাকা দ্বারা অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া, যিনি চক্ষু ফুটাইয়াছেন সেই গুরুদেবকে নমস্কাব। ২

সংসারতাপতপ্ত শিষ্যের ক্লেশ দূর করিবার জন্য যিনি অখণ্ড আনন্দ-স্বরূপ জ্ঞান দান করেন, সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ গুরুদেবকে নমস্কার। ৩

সর্ব্ববেদের শিরোমণি যাঁহার পদযুগলে বিরাজিত, বেদান্তরূপী পদ্মের বিকাশক, সূর্য্যস্বরূপ সেই গুরুদেবকে নমস্কার। ৪

(অজ্ঞানগুরু।)

অপাত্রকে গুরুত্বে বরণ করিলে, অবিবেকী শিষ্যের দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। "অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ" (মুণ্ডক—১।২।৮)। অন্ধের দ্বাবা পবিচালিত অন্ধের ন্যায় বিপন্ন অর্থাৎ মোহগর্ত্তে পতিত হয়। এই বিষযে একটি গল্প আছে।

এক ব্যক্তির ঘবের পাকা দেওয়ালে একটি হাঁড়ি গাঁথা ছিল। হাঁড়ির মধ্যে ছোলা ছিল। গৃহস্থের ছাগল সেই ছোলা খাইতে যাইযা হাঁড়ি হইতে আর মুখ বাহিব কবিতে পারে না। তখন সেই গৃহস্থ এক উপদেষ্টার পরামর্শ চাহিল। পাণ্ডিত্যাভিমানী পরামর্শদাতা বলিলেন, "দেওয়াল ভাঙ্গিযা হাঁড়ি বাহির করিলে হাঁড়িও থাকিবে, ছাগলের মুখও সহজে হাঁড়ি হইতে বাহির হইবে।" গৃহস্থ তাহাই করিল; কিন্তু তথাপি হাঁড়ি হইতে ছাগলের মুখ বাহির হইল না। তখন সেই পণ্ডিত বলিলেন, "হাঁড়ির নীচদিক্ ভাঙ্গ, কেননা, তাহা হইলে উহার স্কন্ধদেশ ব্যবহার করা যাইবে, ছোলাও বাঁচিয়া যাইবে, এবং ছাগলের মুখও বাহির হইবে।

গৃহস্থ সেই কথামত হাঁড়ি ভাঙ্গিলে, ছাগলের মুখ বাহির হইল বটে, কিন্তু উহার স্কন্ধ ছাগলের গলায় বাঁধিয়া রহিল। তখন সেই পণ্ডিতপ্রবর

বলিলেন, 'তাইত হে, বড়ই মুস্কিল দেখিতেছি। আচ্ছা, ছাগলের গলাটা কাটিয়া ফেল, তাহা হইলেই কলসের স্কন্ধ বাহির হইবে।' ইত্যবসরে পশু, পক্ষী, কীটাদি মিলিয়া, মাটিতে পড়া ছোলা খাইয়া নষ্ট করিল। গৃহস্থ যখন ছাগলের গলা কাটিয়া ফেলিল তখন সে বুঝিতে পারিল, যে পরামর্শদাতার উপদেশানুসারে তাহার হাঁড়ি, দেওয়াল, ছোলা, ছাগল সব এককালে নষ্ট হইযাছে। এইরূপ না ঘটে, এজন্য বিচার করিযা গুরুকরণ করিতে হয়। সদ্‌গুরুর আশ্রয নিতে হয়। সদ্‌গুরুর আশ্রয় না পাইলে দুর্লভ মানব-জন্মই বৃথা হয।

(নরজন্ম দুর্লভ।)

"জন্তূনাং নরজন্ম দুর্ল্লভমতঃ পুংস্ত্বং ততো বিপ্রতা,
তস্মাদ্ বৈদিকধর্ম্মমার্গপরতা বিদ্বত্ত্বমস্মাৎ পরম্ ॥
আত্মানাত্মবিবেচনং স্বানুভবো ব্রহ্মাত্মনা সংস্থিতি।
মুক্তি র্নো শতজন্মকোটি-সুকৃতৈঃ পুণ্যৈর্বিনা লভ্যতে ॥"

(বিবেক চূড়ামণি ২য শ্লোক)

জন্তুর মধ্যে নরজন্ম দুর্লভ। মানব মধ্যে পুরুষ ও পুরুষ মধ্যে বিপ্র, বিপ্র মধ্যে বৈদিকধর্ম্মমার্গে তৎপরতা, তন্মধ্যে আবার বেদবিধির মর্ম্মজ্ঞ দুর্লভ। আবার, যিনি আত্মানাত্ম বিচার দ্বারা স্বানুভূতি করেন তিনি, ঐ মর্ম্মজ্ঞবেত্তা হইতে শ্রেষ্ঠ। যিনি ব্রহ্মের সহিত একাত্মভাবে অধিষ্ঠিত তিনি তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। এই অবস্থাই মুক্তি। শতকোটি জন্মের পুণ্য ছাড়া ইহা লাভ করা যায় না। দেবলোকবাসীরও ক্ষীণ পুণ্য হইয়া, স্বপদলাভার্থ নরদেহ ধারণে তপস্যাদি করিতে হয়।

নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেঽনুভূত্বেমং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি।

(মুণ্ডকোপনিষৎ ১।২।১০)

অর্থাৎ যাহারা ইষ্টপূর্ত্তাদি যাগ অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা স্বর্গপৃষ্ঠে সুকৃত ভোগ করিয়া, পুণ্যক্ষয়ে, এই মর্ত্ত্যলোকে বা হীনতর লোকেও প্রবেশ করে।

"ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি" (গীতা ৯।২১)

এমন সুদুর্লভ নরজন্ম বৃথা অর্থাদি অর্জ্জনে ও স্ত্রীপুত্রাদির সহিত ক্ষণিক উপভোগে ব্যয় করা কি ঘোব মূঢ়তা!

(দেহ মায়িক।)

"মোহং জহি মহামৃত্যুং দেহদারাসুতাদিষু।
যং জিত্বা মুনয়ো যান্তি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥"

(বিবেক চূড়ামণি—৮৮ শ্লোক)

দেহ, দারা কিংবা পুত্রাদিতে মহামৃত্যু স্বরূপ মোহ ত্যাগ কর। এই মোহকে জয় করিয়াই মুনিগণ সেই বিষ্ণুর পরম পদ লাভ করিযা থাকেন। ত্বক্, মাংস, রক্ত-শ্লেষ্মাদি পূরিত এই দেহ নরক স্বরূপ। ইহাতে আত্মবোধ. ত্যাগ কর।

"ছায়া শরীরে প্রতিবিম্বগাত্রে যৎ স্বপ্নদেহে হৃদি কল্পিতাঙ্গে।
যথাত্মবুদ্ধিস্তব নাস্তি কাচিজ্জীবচ্ছরীরে চ তথৈব মাস্তু॥"

(বিবেক চূড়ামণি—১৬৫ শ্লোক)

প্রতিবিম্ব দর্শিত ছায়াশরীরে, স্বপ্নদৃষ্ট শরীরে কিংবা মনঃকল্পিত শরীরে যেমন তোমার কোনও আত্মবুদ্ধি হয় না, এই .জীবশরীরেও সেইরূপ মমত্ববিহীন হইও। তোমার কত জন্ম হইয়াছে। জন্মে জন্মে কত পিতামাতা, স্ত্রীপুত্রাদি উপভোগ হইয়াছে। কৈ, তাহাদের জন্য ত

তোমার কোনও মমতা দেখা যায় না ? এজন্মের পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্রাদিতে এত মমত্ব কেন ? গৃহ আভরণ ও বস্ত্রাদিতে আমার,, আমার করিলেও লোকে ইহা বুঝিতে পারে যে, এসব আমা হইতে ভিন্ন। দেহী সেইরূপ পঞ্চকোষ বেষ্টিত হইলেও, আত্মা দেহ বা কোষাদি হইতে ভিন্ন। কাজেই উহাদের প্রতি মমতা করা ভ্রান্তিমাত্র।

(সাধন চতুষ্টয়।)

এই অধ্যাত্মবিদ্যায প্রবেশ করিতে হইলে সাংসারিক বিষয়াদি হইতে ইন্দ্রিয়দিগকে মুক্ত করিয়া ব্রহ্ম বিষয়ে নিযুক্ত করিতে হয়। ইন্দ্রিয়গণ স্বভাবতঃই বহির্মুখ।

"পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।"
(কঠশ্রুতি ২।১)

স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা ইন্দ্রিয়গণকে বহির্মুখ করিয়া সৃষ্টি কবিয়াছেন, তাই তাহারা বাহিরের পদার্থ দেখে। অন্তরের আত্মাকে দেখিতে পায় না। ইহাদিগকে অন্তরের দিকে নিয়োগ করিতে হইলে, বহু যত্ন করিতে হয়। অপিচ, ইহা "সাধন চতুষ্টয়" নামক সাধনেব অপেক্ষা করে। সাধনচতুষ্টয় সাধিত হইলে, হৃদয় নির্ম্মল হইয়া তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হয়। দর্পণ যেমন মূলযুক্ত হইলে, তাহাতে প্রতিবিম্ব পড়ে না, হৃদয়ও সেইরূপ নির্ম্মল না হইলে, উহাতে অধ্যাত্মবিদ্যা বা জ্ঞান প্রতিফলিত হয় না।

১। নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক।

"নিত্যবস্ত্বেকং ব্রহ্ম তদ্ব্যতিরিক্তং সর্ব্বমনিত্যম্।"
(তত্ত্ববোধ)

এক ব্রহ্মই নিত্য, আর সব অনিত্য। নিত্যে আস্থা ও অনিত্যে অনাস্থা দৃঢ় করিতে হয়। স্বপ্নেও যেন এই ভাবটি অবিলুপ্ত থাকে।

২। বিরাগ বা বৈরাগ্য।

বিরাগ শব্দের অর্থ রাগ বিহীন। অর্থাৎ অনিত্য পদার্থে রাগ বা আসক্তি যাহাদের দূর হইয়াছে। "ইহ স্বর্গভোগেষু ইচ্ছাবাহিত্যম্"—ইহলোকে বা পরলোকে স্বর্গাদিতে ভোগের বাসনা ত্যাগ করা। বাসনা বিসর্জ্জনই মুক্তি বা মোক্ষ। এই জন্মে ব্রহ্মজ্ঞান না হইলে পুনরায় যে জন্ম হইবে তখন এই পুত্র পরিবার কোথায় থাকিবে? এই সংসারে জীব জন্মিবার জন্য মরে ও মরিবার জন্য জন্মে। জলৌকা যেমন এক পত্র হইতে পত্রান্তরে যাইতে দ্বিতীয় পত্রের আশ্রয় অবলম্বনে প্রথম পত্র ত্যাগ করে। তদ্বৎ জীব দ্বিতীয় শরীর অবলম্বন করিয়া এই স্থূল শরীর ত্যাগ করে। কালেক্টরীর খাজনাখানায় যাহারা প্রহরী নিযুক্ত থাকে তাহারা যেমন খুব হুসিযার ভাবে সঙ্গীন, বন্দুকাদি লইয়া পাহারা দেয়, কিন্তু পাহারা বদলাইবার সময় দ্বিতীয় ব্যক্তিকে পাহারায় রাখিয়া নিশ্চিন্তে নিজ গৃহে যায়, খাজানাখানায় এই অতুল বিভব ছাড়িয়া যাইতেছে, একথা একবার মনেও আনেনা—তেমনি এই সংসারে পুত্র বিত্তাদি বিষয়ে তুমি প্রহরী মাত্র। তাহারা তোমার নহে। তুমিও তাহাদের নও। তবে মমতা কিংবা বিচ্ছেদাদি জন্য শোক বা পরিতাপ কেন? "থাকে লক্ষ্মী যায় বালাই।" পাহারার দায় হইতে অব্যাহতি পাইলে প্রহরীর যেরূপ শান্তি, এষনাত্রয়ে বিতৃষ্ণ মুমুক্ষুর ব্রহ্ম নির্ব্বাণরূপ পরম শান্তি তদপেক্ষা অনন্ত কোটীগুণ শ্রেষ্ঠ। সংসার ত্যাগের সুযোগে, অতুল আনন্দ লাভের সুযোগ হইল মনে করিতে হয়। এই ভাব আনিবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট হইবে। যতক্ষণ সংসার, ততক্ষণ পাহারাদারের মত হুঁসিয়ার হইয়া সব রক্ষা করিবে, আর মনে ভাবিবে যে এসব আমার নহে।

৩। শমাদি ষট্ সম্পত্তি।

(১) শম—ইন্দ্রিয় নিগ্রহ। (২) দম—মন নিগ্রহ। (৩) উপরম বা উপরতি—ইন্দ্রিয় বৃত্তির বিষয় অর্থাৎ রূপ, রসাদিতে প্রত্যাবর্ত্তন না হয় তৎভাবের আনয়ন অর্থাৎ সন্ন্যাস। (৪) শ্রদ্ধা—গুরু ও বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাস। (৫) তিতিক্ষা—শীত, গ্রীষ্মাদি ও মান, অপমানাদি দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা। (৬) সমাধান—ব্রহ্মে চিত্তৈকাগ্রতা।

৪। মুমুক্ষত্ব।

অর্থাৎ মায়ার আবরণ শক্তি ও বিক্ষেপ শক্তি দ্বয়েব মোহ হইতে মুক্তি লাভার্থ আপ্রাণ চেষ্টা।

পূর্ব্বে, আট দশ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে, ছেলেকে উপযুক্ত গুরুর হস্তে সমর্পণ করিয়া দিত। অন্নবস্ত্রাদি উপভোগ্য পদার্থ হইতে নিবৃত্ত থাকিবার পন্থা গুরু সেখানে শিখাইতেন। জল ও রৌদ্র যাহাতে চিত্তকে বিক্ষিপ্ত না করে,সেজন্য তিতিক্ষা অভ্যাস দ্বারা তৎসহনশীল করিতেন। ভিক্ষালব্ধ আহার্য্য গুরুকে অর্পণ করিয়া, গুরুদত্ত প্রসাদে সন্তুষ্ট থাকিতে হইত। ভিক্ষায় মানাপমান জ্ঞান থাকে না। শিষ্য গুরুগৃহের মৃত্তিকা, জল, কাষ্ঠ সংগ্রহাদি, ভারবহনকার্য্য ও অন্যান্য কার্য্য করিয়া, সর্ব্ববিষয়ে পটু হইত। আলস্য-রহিত হইয়া গুরু-শুশ্রূষা করিত। বিভিন্ন স্থানেব বহু শিষ্য একত্রাবস্থান করায়,—'অয়ং নিজঃ পরো বেতি গণনা লঘুচেতসাম্'—তাহাদের আত্ম-পর ভেদ-বুদ্ধি দূর হইয়া, সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি জাগ্রত হইত। এইরূপে দ্বাদশবর্ষ বা ততোধিক কাল ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করায়, শারীরিক ও মানসিক বল এবং সাধন-চতুষ্টয় আয়ত্ত হইলে পর, গুরুর নিকট বিদ্যালাভ হইত। গুরুকৃপায় ও আত্মকৃপায় অল্পসময়েই বিদ্যালাভ করিয়া, গৃহস্থ-

হইলেও দীর্ঘজীবী হইত। বাল্যকালের সুদৃঢ় শুভ সংস্কার বশতঃ গার্হস্থ্য জীবনও সুখের হইত। ব্রহ্মচর্য্যাদি প্রায় অটুট থাকিত। অথচ পরে, "পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ"—এই মনুবাক্যানুযায়ী বানপ্রস্থ আচরণেও কুণ্ঠিত হইত না। আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে, যাহার পিতা দুই সন্ধ্যা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, সে ছেলেও হোষ্টেলের বৈদ্যুতিক আলোকযুক্ত ত্রিতল বাড়ীতে বাস করে। বিলাস সাগরে ডুবিয়া কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়। এই সব কুসংস্কার দূর কবিয়া সুসংস্কারে আনয়ন করা বহু কষ্টকর হইয়া থাকে। তবে কর্ণধার সজ্জন, কাজেই হতাশ হইবার কারণ নাই। ইহা আনিতেই হইবে। এই একদেহে না কুলায়, কত লক্ষ দেহই ত বিফলে গিয়াছে। না হয়, আগামী দেহে যোগভ্রষ্টের ফল ফলিবে। 'শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে'। (গীতা) পঞ্চতন্ত্রের 'শশকচ্ছপ' গল্পে কচ্ছপের মত ধীর ও নিশ্চয ভাবে চলাই ভাল।

অষ্টম বল্লী।

(অভ্যাস যোগ।)

অভ্যাস অতি শক্ত যোগ। সদ্ অভ্যাস যেমন উপকারী, কদভ্যাস তেমনি দুস্ত্যাজ্য। গো, ছাগলাদি পালিত হইয়া, অভ্যাস বশে বন্ধনপ্রিয় হয়। হরদ্বারস্থিত আশ্রমের গাভীগুলি সকালবেলা দোহনান্তে, বাছুর

রাখিয়াই—কেহ আশ্রমের বাহির করিয়া দিলে—বিল্লোকেশ পর্ব্বতের সানুদেশে ঘাসপত্রাদি খাইয়া চরিয়া বেড়ায়। সন্ধ্যা বেলা ঘটোঘ্নী হইয়া ফিরিয়া আসে। তৎপর গঙ্গার জল পান করিয়া আশ্রমে প্রবেশ করে। দোহনান্তে গলায় দড়ি দিয়া বাহিবে খুঁটিতে বাঁধিয়া রাখা হয়। তথায় ভূমিতে শুইয়া ইহারা জাবর কাটিতে থাকে। যার বাছুর হয় নাই কিংবা যার বাছুর দুধ ছাড়িয়াছে, তারও ঐ এক দশা। ইহারা বনের ঘাস ও গঙ্গাব জল খাইয়া কেন বটবৃক্ষেব নীচে পড়িয়া থাকে না? আশ্রমে আসিযা বন্ধন-রজ্জু গলায় না পরিলে ইহাদের ভাল লাগে না। পাখীগুলি প্রাতে উঠিযা বাসা ছাড়িয়া ২।৩ মাইল পর্য্যন্ত যাইয়া আহার অন্বেষণ করে। সন্ধ্যা হইলেই আবার সেই ২।৩ মাইল পথ উডিয়া, নিজ বাসায় ফিরিয়া আসে। ইহারা যে স্থানে আহার খুঁজিয়া বেডায়, সন্ধ্যাগমে সেখানেই কোন বৃক্ষে বাত্রি যাপন করে না কেন? এইটি মমতা রূপ মোহের কার্য্য। যদি কাহারও স্ত্রী বহু পুত্র কন্যা রাখিয়াও পরলোক গমন করে, তখন সেই মোহান্ধ স্বামী পুনরায় বিবাহ করার জন্য পাগল হয়। এইটুকু বিচার বুদ্ধি নাই যে, শৃঙ্খল ত ছুটিয়াছে—তবে আর কেন? কি মূঢ়তা! কি সংস্কার!

"মূঢ় জহীহি ধনাগম তৃষ্ণাম্।
কুরু তনুবুদ্ধি মনঃসুবিতৃষ্ণাম্॥"

(মোহমুদ্গর ১ শ্লোক)

হে মূঢ়! ধন, জন ও বিষয় ত্যাগ কর। শরীর, মন ও বুদ্ধিতে নির্ম্মম হও।

(কাম—বিল্বমঙ্গলের আখ্যান।)

দেখ, চামরি অর্থাৎ দেহ সৌষ্ঠবে মুগ্ধ হইয়া লোকে কতদূর মূর্খতার পরিচয় দেয়। তুলসীদাস বলেন,—"দিন্‌কা মোহিনী, রাতকা বাঘিনী,

পলক পলক লোহ্ চোষে। আদমি সব বাউরা হোকে ঘর ঘরমে বাঘিনী পোষে।" স্ত্রীলোক দিনে সৌন্দর্য্য ও চাহনি দ্বারা মুগ্ধ করে। রাত্রে রক্তের সার হইতে উৎপন্ন বীর্য্য হরণ দ্বারা রক্তহীন ও দুর্ব্বল করে। তথাপি লোকে নির্ব্বুদ্ধিতা বশে, ঘরে ঘরে রক্ত-শোষক বাঘিনী পোষে। আবার যৌবন সুলভ চপলতা বশে মোহ-সম্পন্ন মানব ইন্দ্রিয়গণেব মোর ফিরাইযা ভগবৎদর্শনাদি দ্বারা কৃতার্থ হয়। বিল্বমঙ্গলের উপাখ্যানে এই বিষয়টী অতি সুন্দর ভাবে ফুটিয়াছে।

ব্রাহ্মণ যুবক বিল্বমঙ্গল, চিন্তামণি নাম্নী এক বারবণিতার রূপে মজিয়া তাহার প্রতি এমনি আসক্ত হইয়াছিল যে, এক দিনের তরেও তাহার অদর্শন সহ্য করিয়া গৃহে তিষ্ঠিতে পারিত না। পিতৃ শ্রাদ্ধের দিন সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নানা কাজে ব্যস্ত থাকায বেশ্যালয়ে যাওয়া ঘটিল না। সন্ধ্যার পর গৃহে থাকা তাহার পক্ষে অসহ্য হইযা উঠিল। বাহিরে ঘোর অন্ধকার। বায়ুর প্রচণ্ড বেগে তরঙ্গিনী উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া অট্টহাস্য করিতেছে। নদীর অপর পারে চিন্তামণির গৃহ। বিল্ব-মঙ্গল, ধীরে ধীরে বাহিরে আসিল। কিন্তু এই দুর্য্যোগের সময় নদীতে এক খানিও নৌকা ছিল না। একটী শব নদীর তীরে ভাসিয়া আসিতেছিল। কামান্ধ যুবক সেই গলিত শবকে কাষ্ঠখণ্ড মনে করিয়া, তাহা অবলম্বনে নদী পার হইল। তখন রাত্রি দু'প্রহর হইয়াছে। চিন্তামণি ঘুমে অচেতন। গৃহের দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ। শুধু দ্বিতলের যে প্রকোষ্ঠটিতে চিন্তামণি ঘুমাইতেছিল তাহার একটী দ্বার খোলা ছিল, কিন্তু সেখানেও উঠিবার কোন পথ ছিলনা। একটী সাপ প্রাচীরে ঝুলিতেছিল। ভোগ লালসার তাড়নায় অধীর হইয়া, বিল্বমঙ্গল সেই সাপকে রজ্জু বোধে আশ্রয় করিয়া, উপরে উঠিল। চিন্তামণি জাগরিত হইয়া, বিল্বমঙ্গলের গাত্রের পূতিগন্ধ

পাইল, এবং অনুসন্ধান ক্রমে সবই জানিতে পারিল। তখন সেই বেশ্যার হৃদয়েও যেন অনুতাপের এক অস্ফুট আলোক ধীরে ধীরে জ্বলিতে প্রয়াস পাইল। সে বিল্বমঙ্গলকে শব, সর্পাদি ব্যাপার বুঝাইয়া ভর্ৎসনার স্বরে বলিল, "হায়। মোহান্ধ লীলাশুক, (হিন্দী সাহিত্যে বিল্বমঙ্গল ঐ নামেই পরিচিত) তুমি এই বেশ্যার কায়িক রূপে যতটা অধীর হইয়াছ, আনন্দময় জগদীশ্বরের জন্য যদি ইহার আংশিক উন্মত্ততাও তোমাতে আসিত, তাহা হইলে আজ তুমি কি অমৃতই লাভ করিতে! বেশ্যার মুখে এই অপূর্ব্ব তিরস্কার শুনিয়া, বিল্বমঙ্গলেব চোখ ফুটিল। সেই মুহূর্ত্ত হইতেই সে সমস্ত বাসনায় জলাঞ্জলি দিয়া ভগবানের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করিল। ইন্দ্রিয়বৃত্তি, যাহা এতদিন বেশ্যার উপভোগে নিযুক্ত ছিল, তাহা ভগবৎ দর্শনে নিযুক্ত করিয়া কৃতার্থ হইল।

(বাসনাক্ষয়।)

তাই বলিতেছিলাম যে, এই বাসনার বিসর্জ্জনেই মুক্তি বা মোক্ষ।

অশেষেণ পরিত্যাগো বাসনানাং য উত্তমঃ।
মোক্ষ ইত্যুচ্যতে ব্রহ্মন্ স এব বিমলক্রমঃ॥

(যোগবাশিষ্ঠ)

হে ব্রহ্মন্। উত্তম বাসনা সমূহ নিঃশেষরূপে পরিত্যাগ করাই মোক্ষ। তাহাই শ্রেষ্ঠ কল্প। বাসনারূপ সূত্রে এই মায়াময় জগৎ গ্রথিত। সূত্র ছিন্ন হইলেই সব বিনষ্ট হয়।

"বদ্ধোহি বাসনাবদ্ধো মোক্ষঃ স্যাদ্বাসনাক্ষয়ঃ।"

(মুক্তিকোপনিষৎ ২।৭৬)

বাসনা দ্বারা বদ্ধকে বদ্ধ এবং উহার ক্ষয়কে মোক্ষ বলিয়া থাকে।

"জন্মান্তরশতাভ্যস্তা মিথ্যা সংসার বাসনা।
সা চিরাভ্যাসযোগেন বিনা ন ক্ষীয়তে ক্বচিৎ॥"

(মুক্তিকোপনিষৎ ২।১৫)

শত জন্মের অভ্যাস বশতঃ মিথ্যা সংসারিক বাসনা, বহুকাল অভ্যাসযোগ ব্যতীত ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না।

এই সংসাররূপী বৃক্ষের নাম মন। সংকল্পাত্মক মনের নিগ্রহেই সংসার নাশ পাইয়া থাকে। চিত্তই বিষয়ের কারণ। চিত্ত থাকিলেই ত্রিজগতের অস্তিত্ব। বাসনা শূন্য হইলেই জগৎ নষ্ট হয়। মনের সংকল্প যদি উত্থান মাত্রই লয় করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে অল্প আয়াসেই সিদ্ধি লাভ হয়। "ধ্যানং নির্বিষয়ং মনঃ"। সুষুপ্তি ব্যতীত মন যখন বিষয়হীন তখনই ধ্যান। যখন মন লীন বা নির্ব্বাপিত তখনই মুক্তি। তখন অহঙ্কার, অভিমান, সংকল্প, বিকল্প না থাকায় তত্ত্বজ্ঞান বিকাশ হয়। সুষুপ্তিতেও মন লয় হইয়া জীব ব্রহ্ম-স্বরূপ গত হয়, কিন্তু মোহাচ্ছন্নত্ব নিবন্ধন বুঝিতে পারে না আমিই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, অন্য কিছু নাই। এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান হইলে মুক্তি (অর্থাৎ কর্ম্মফলে পুনঃ পুনঃ জন্মলাভ ও সংসার দুঃখ ভোগ হইতে মুক্তি)। কর্ম্মফলে জন্ম জন্মান্তের জ্ঞান দ্বারা কর্ম্ম ও তৎফল দগ্ধ হইলে, দগ্ধ বীজবৎ উহা আর অঙ্কুরিত হয় না।

"ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে"

(মুণ্ডকোপনিষৎ ২।৯)

সেই পরব্রহ্মের দর্শন হইলে অর্থাৎ আত্মদর্শনের সহিত ইহার (দ্রষ্টার) কর্ম্মসকল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

"জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা"

(গীতা ৪।৩৭)

জ্ঞান অগ্নি দ্বারা সর্ব্বপ্রকারের কর্ম্ম ভস্মীভূত হয়। এইরূপ স্পষ্ট

শ্রুতি, স্মৃতি বাক্য থাকিতেও কেহ কেহ বলেন প্রারব্ধ দগ্ধ হয় না। অর্থাৎ বিদেহ মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত জীবন্মুক্তেরও প্রারব্ধ ভোগ হয়। যেমন ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত তীর,—লক্ষ্যে না বিদ্ধ হউক্,—এরূপ ইচ্ছা হইলেও যথাস্থানে পৌহুছে, নিবৃত্ত হয়না; যেমন কুলালচক্র ঘুরিতে ঘুরিতে ভাণ্ড তৈয়ার হইলেই চক্রগতি স্থির হয়না, পূর্ব্ব প্রয়োজিত শক্তি বশে কিযৎকাল চলিয়া থাকে, তদ্বৎ প্রারব্ধ, ভোগে পরিসমাপ্ত হয়। ইহা বিচারসহ বলিযা বোধ হয়না।

এক বেনে, ঘৃতের হাঁড়ি ভাঙ্গা জানিয়া, হাঁড়ি হইতে ঘৃত তুলিয়া রাখিয়া, হাঁড়িটিকে বাহিরে ফেলিয়া দিল। এক কুকুর হাঁড়িটাকে চাটিতে আরম্ভ করিল। ইহা দেখিয়া, বেনের প্রতিবেশী তাহাকে ঘৃত রক্ষার্থ সাবধান হইতে বলিলে, বেনে উত্তর করিল, 'আমি সার পদার্থ টুকু তুলিয়া রাখিয়াছি। এখন ঐ হাঁড়ি কুকুরে চাটুক, কি ভাঙ্গিয়া যাউক, আমার তাহা দেখিবার কোনও প্রয়োজন নাই'।

আত্মজ্ঞানরূপ ঘৃত সযত্নে তুলিয়া রাখিলে, প্রারব্ধরূপী কুকুর দেহকে লইয়া ইচ্ছানুরূপ খেলা করুক। সুখ দুঃখের নিলয়, বহিরাবরণ স্বরূপ এই মিথ্যা দেহের সহিত তোমার আর কি সম্পর্ক রহিয়াছে? তবে, মূর্খ প্রতিবেশী হয়ত মনে করিবে,—আত্মজ্ঞানীও দেহ ধারণ করিয়া সুখ দুঃখ উপভোগ করে।

(কর্ম্ম শেষ কখন হয়।)

"তত্ত্বজ্ঞানোদয়াদূর্দ্ধং প্রারব্ধং নৈব বিদ্যতে।
দেহাদিনামসত্ত্বাৎ তু যথা স্বপ্নো বিবোধতঃ॥"

(অপরোক্ষানুভূতিঃ ৯১)

নিদ্রা হইতে জাগরিত ব্যাক্তির নিকট যেমন স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়ের অস্তিত্ব থাকে না, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে প্রারব্ধ অর্থাৎ জন্মান্তরিন্ কর্ম্মের অস্তিত্ব শেষ হয়। জ্ঞানীর চক্ষে, দেহত্রয়ই মিথ্যা, সংকল্পমাত্র। জাগ্রদাবস্থায় স্বপ্নবৎ অলীক। অজ্ঞানীর চক্ষে, জ্ঞানীর প্রারব্ধ দেহত্যাগ পর্য্যন্ত থাকে এমন বোধ হইতে পারে; কিন্তু জ্ঞানীর পক্ষে নহে। কাপড় পুড়িয়া গেলেও যেমন সূতা, পাড় প্রভৃতির 'লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে, তেমনি ব্রহ্মজ্ঞানীর জ্ঞান-দগ্ধ দেহ নামমাত্রে পর্য্যবসিত হয়। কর্ম্ম ভোগ করিবার জন্য কিছু অবশেষ থাকে না।

"বাহ্যে নিরুদ্ধে মনসঃ প্রসন্নতা।
মনঃপ্রসাদে পরমাত্মদর্শনম্ ॥
তস্মিন্ সুদৃষ্টে ভববন্ধনাশো।
বহির্নিবোধঃ পদবীবিমুক্তেঃ ॥

(বিবেকচূড়ামণি—৩৩৭)

বাহ্য শ্রবণাদি বিষয় মিথ্যাজ্ঞানের মনে গতি নিরুদ্ধ হইলে, চিত্ত প্রসন্ন হয়। মন নির্ম্মল হইলেই স্বয়ম্প্রকাশ পরমাত্মার সাক্ষাৎকার ঘটে। এই দর্শন সুদৃঢ় হইলে, ভববন্ধন বিনষ্ট হয়। বাহ্যজগতের প্রতি মনের গতি নিরোধ করাই মুক্তিপদ।

(দৃশ্য জগতের অলিকতা।)

ভ্রমস্য জাগতস্যাস্য জাতস্যাকাশবর্ণবৎ।
অপুনঃ স্মরণং মন্যে সাধো বিস্মরণং বরম্ ॥১
দৃশ্যাত্যন্তাভাববোধং বিনা তন্নানুভূয়তে।
কদাচিৎ কেনচিন্নাম স্ববোধোঽন্বিষ্যতামতঃ ॥২

স চেৎসংভবত্যেব তদর্থমিদমাততম্ ।
শাস্ত্রমাকর্ণয়সি চেৎ তত্ত্বমাপ্স্যসি নান্যথা ॥৩
জগদ্ভ্রমোঽয়ং দৃশ্যোঽপি নাস্তেবেত্যনুভূয়তে ।
বর্ণো ব্যোম্ন ইবাখেদাদ্বিচারেণামুনানঘ ॥৪
দৃশ্যং নাস্তীতি বোধেন মনসো দৃশ্যমার্জনম্ ।
সম্পন্নং চেত্তদুৎপন্না পরা নির্ব্বাণনিবৃতিঃ ॥৫
অন্যথা শাস্ত্রগর্ত্তেষু লুঠতাং ভবতামিহ ।
ভবত্যকৃত্রিমাজ্ঞানাৎ কল্পেবপি ন নিবৃত্তিঃ ॥৬

(যোগবাশিষ্ঠ—৩।২।৭)

আকাশ বর্ণহীন হইলেও যেমন নীল বলিয়া প্রতিভাত হয়, জগৎ ও তেমনি অবস্তু হইয়া বস্তুরূপে প্রতীত হয়। এই জগৎ সম্পর্কে চিব বিস্মৃতিই মুক্তি ।১

দৃশ্যপদার্থমাত্রই অস্তিত্ববিহীন ; এই জ্ঞান না হইলে মুক্তির স্বরূপ অনুভব করা যায় না ।২

এই অধ্যাত্ম বিচার শ্রবণ করিলেই তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায় ।৩

এই ভ্রমাত্মক জগৎ দৃশ্য হইলেও আকাশবর্ণেব ন্যায় অলীক। স্থির চিত্তে বিচার করিলেই ইহা অনুভূত হয় ।৪

দৃশ্য পদার্থ নাই ; এই জ্ঞান হইলে মন হইতে জগৎ প্রপঞ্চ মুছিয়া যায়। ইহাতেই আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তি ও পরম নির্ব্বাণ লাভ হয় ।৫

ইহা না করিলে কল্প পবিমাণ কাল শাস্ত্রগর্ত্তে পড়িয়া থাকিলেও অজ্ঞান নিবৃত্তি হইবে না ।৬

যাহার প্রাণে এই মুক্তি পাইবার আকুল অভিলাষ জাগে, তিনিই মুমুক্ষু। তিনিই ধন্য।

নবম বল্লী।

(বাসনার প্রকার ভেদ।)

শুদ্ধা ও মলিনা ভেদে বাসনা দুই প্রকার। "মলিনা জন্মহেতুঃস্যাৎ শুদ্ধা জন্মবিনাশিনী"। মলিনা পুনর্জ্জন্মের কারণ হয, আর শুদ্ধা দ্বারা তাহা বারিত হয়। যে মৃত্যুর পর আব জন্ম হয় না তাহাই প্রকৃত মৃত্যু। সাধারণতঃ মৃত্যু বলিতে যাহা বোঝা যায়, তাহাতে সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর অটুট অবস্থায় থাকিয়াই জলোকার মত আর একটী স্থূল শরীর গ্রহণ করিবার জন্য বাহির হইয়া যায়। জ্ঞান দ্বারাই শুধু সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরের বিলয় ঘটে। ইহাই প্রকৃত মৃত্যু।

"জাতো হি কো যস্য পুনর্ন জন্ম।
কো বা মৃতো যস্য পুনর্ন মৃত্যুঃ॥

(প্রশ্নোত্তরী—১৮)

গৃহ পালিতা হস্তিনীর সাহায্যে যেমন বন্য হস্তীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়, মলিনা বাসনাও সেইরূপ মানুষের চিত্তবৃত্তিকে নরকের পথে সোনার শিকলে বদ্ধ করে। ইহা রজ ও তম গুণাত্মক। শুদ্ধা বাসনা সত্ত্বগুণাত্মিকা। গুণ ভেদে লোকের ব্যবহারেরও ভেদ ঘটিয়া থাকে। অগ্নিতে ভর্জ্জিত বীজ বপন করিলে, তাহার আর অঙ্কুরোদ্গম হয় না। তদ্বৎ জ্ঞানাগ্নিদগ্ধ কর্ম্মীর কর্ম্ম বন্ধের কারণ হয় না। হাতীকে স্নান করাইয়া, সুশাসনে না রাখিলে, সে আবার কাদায় লুটাইতে আরম্ভ

করে। সংসারী ব্যক্তিও ইন্দ্রিয়গুলিকে সুশাসনে না রাখিলে, গুরু দ্বারা সংস্কৃত হইয়াও আবার পঙ্কিল বিষয়বাসনায় অভিভূত হইয়া পড়ে। কাজেই গুরুশক্তির দরকার। অন্তঃকরণ শুদ্ধ রাখিবার জন্য সাত্ত্বিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান আবশ্যক। এই শুদ্ধ সত্ত্বের আশ্রয়ে থাকিয়া যিনি কাজ করেন, তিনি 'আত্মা সত্য, জগৎ অসত্য' জানিয়াই কাজ করেন। তাঁহার কর্ম্মফল আর বন্ধনের কারণ হয় না। কিন্তু এইরূপ অবস্থায় থাকিয়াও জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে মৃত্যু হইলে, তাঁহার সদ্গতি ও পুনর্জন্ম হইবে।

(কিসে কর্ম্মফলে বদ্ধ হইতে হয় না।)

"ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে॥

(গীতা ৪।১৪)

গীতায় ভগবান পরমাত্মার স্বরূপ সম্পর্কে বহু কথা বলিয়াছেন। এখানে "মাং" শব্দের দ্বারা 'আত্মার স্বরূপ' বুঝিতে হইবে। আত্মা শুদ্ধ, বুদ্ধ, অক্রিয় ও অপাপ-বিদ্ধ। কোন কর্ম্মফলই তাহাতে লাগিতে পারে না। বুদ্ধি আশ্রিত লিঙ্গ দেহই ভোক্তা, আত্মা ভোক্তা নহে। এইরূপ সংস্কার লইয়া কাজ করিলেই আর কর্ম্মফলে বদ্ধ হইতে হয় না।

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহংকারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥"

(গীতা ৩।২৭)

প্রকৃতি গুণ দ্বারা সর্ব্ব কর্ম্ম করেন। অহঙ্কারবিমূঢ়ব্যক্তি, 'আমি কর্ত্তা' এইরূপ মনে করিয়া বদ্ধ হয়। যে নিজকে অকর্ত্তা বলিয়া জানে তাহার কর্ম্ম বন্ধনের কারণ হয় না। মুষ্টি পরিমেয় অন্ন দান হইতে ব্রহ্মলোক

লাভ পর্য্যন্ত যত কর্ম্ম সবই বিদ্যা (উপাসনাদি) ও অবিদ্যা জনিত, শুদ্ধ ও মলিন কর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত। এতদুভয়ের পারে পরমাত্মারসাক্ষাৎকার। যাহারা এই দুইটীকে লইয়াই পরিতৃপ্ত হয় তাহারা আত্মঘাতী।

অসূর্য্যানাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কেচাত্মহনোজনাঃ ॥

মায়ারূপ তম আবৃত হইয়া দেবাদিলোকে তাহারা গমন করে। যাহারা আত্মদর্শন জন্য চেষ্টান্বিত না হইয়া কর্ম্মাদিতে নিযুক্ত থাকে, তাহারা আত্মহত্যাকারী। আত্মা কি, ইহা অনুসন্ধান করিতে করিতে "আমিই ব্রহ্ম" ইহা অনুভূত হইলেই আত্মদর্শন ঘটে। তাহার ফলে কর্ম্ম ও হৃদয়গ্রন্থিরূপ কাম—যদ্দ্বারা অহঙ্কার ও চিদাত্মার ঐক্য ভ্রম জন্মে—বিনষ্ট হয়। আমার স্ত্রী, আমার পুত্র প্রভৃতি আমিত্ব বুদ্ধি বহু জন্মের সংস্কার দোষে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার মূল অনেকটা অশ্বত্থ বৃক্ষের মূলের ন্যায়। যতই কাট না কেন, কোথায় যেন একটুকু থাকিয়া যায়। বহুদিনের এই সংস্কার কেবল আত্মদর্শনে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। ইহাকে সমূলে নষ্ট করিতে হইলে, বিচার, বৈরাগ্য ও বহু তপস্যার প্রয়োজন এবং বহুজন্ম শুদ্ধসত্ত্বে অবস্থিতি চাই। তাই ভগবান বলিয়াছেন, "বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে"।

(ব্রহ্মাভ্যাস।)

বহু জীবন ব্রহ্ম চিন্তনে অতিবাহিত হইলে, মায়ার আবরণ জনিত কদভ্যাস ছিন্ন হয়। ব্রহ্মাভ্যাসআয়ত্তচিত্তে স্বয়ংপ্রকাশ জ্ঞান প্রকাশমান হন।

"তচ্চিন্তনং তৎকথনং অন্যোঽন্যং তৎপ্রবোধনম্।
এতদেকপরত্বঞ্চ ব্রহ্মাভ্যাসং বিদুর্ব্বুধাঃ।"

তাঁহাকে লইয়াই চিন্তা ও আলোচনা কর। তাঁহার সম্পর্কেই তোমার বুদ্ধিকে প্রবোধ দেও। তাঁহাতে একনিষ্ঠ হও, অর্থাৎ কেবল তাঁহাকে লইয়াই থাক, চিত্তবৃত্তি অন্য কিছুতে না যায় ইহাই ব্রহ্মাভ্যাস।

বিক্ষেপ শক্তির ফলে এই বিচিত্র সংসার। যাহাতে এই বিচিত্রতার মধ্যে নিজেও জড়িত না হও, তজ্জন্য সর্ব্বদা এই বৈচিত্র্যের মধ্যেই একের সমাবেশ লক্ষ্য করিবে। মনে কর, একটী ময়ুর তোমার দৃষ্টিপথে পড়িল। অমনি তোমার বহির্মুখ ইন্দ্রিয় সকল চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। চক্ষু তাহার পালক ও অঙ্গের চাকচিক্য, কর্ণ তাহার মধুর কেকারব, স্পর্শ উহার পুচ্ছের কোমলত্ব ও জিহ্বা উহার গুণ বর্ণনা ভোগ করিবার জন্য নাচিয়া উঠিল। কিন্তু তখনই বিচার দ্বারা ইহাদিগকে থামাইতে হইবে। বিচার করিবে, যখন ইহা ডিম্বের মধ্যে ছিল তখন ইহার বিচিত্রতা কোথায় ছিল। যদি সন্দেহ হয় যে ডিম্ব অবস্থায়ও ইহা একাধিক অংশে বর্ত্তমান ছিল, অমনি প্রশ্ন করিবে— 'উহা যখন ময়ূর বীর্য্যে তখনও কি উহাতে বৈচিত্র্য ছিল? উত্তর হইবে, না। এই বৈচিত্র্য অনিত্য, আর উহার মধ্যস্থিত চৈতন্য সৎপদার্থ ও অন্য প্রাণী দেহস্থ চিৎ এক। ডিম্বস্থিত চৈতন্য কুসুম, সাদা বেষ্টনী ও খোসার আবরণে আবৃত। তদ্বৎ ব্রহ্ম মায়ায় আবরণে আবৃত। কুসুম জাত পালক ও চর্ম্ম, মাংস প্রভৃতির বিচিত্রতা বিক্ষেপ শক্তির কার্য্য। মায়া এই কার্য্যের কারণ। ময়ূরের যে বুদ্ধি বৃত্তি আছে তাহাতেই সেই সচ্চিদানন্দের চিৎ প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। এই ময়ুর নিজের ভুবন-মোহন রূপ লইয়া যতই গর্ব্ব করুক না কেন, উহাতে ও আমাতে, উহার দেহ ও এই আমার দেহ একই পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত এবং সেই এক অখণ্ড ব্রহ্ম চৈতন্য বিরাজমান। পুচ্ছ তুলিয়া

নৃত্য করিবার সময় উহার প্রাণে যে আনন্দ, তাহা ব্রহ্মানন্দেরই কণামাত্র।

এইরূপ চিন্তা দ্বারা চিত্তকে ব্রহ্মে লীন করিবে। আকাশের পানে তাকাইয়া দেখিলে দেখিবে অসংখ্য নক্ষত্ররাজি আকাশ ছাইয়া আছে। মায়াশক্তি এইরূপ কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংস করিতেছে "ব্রহ্মাণ্ডানাং কোটী কোটী প্রসুবে" ইহারাও ক্ষণিক দেহের ন্যায় পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূতের পিণ্ড মাত্র। এক অবিনাশী আত্মাই সর্ব্বত্র বিরাজমান।

"জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্ত্যাদি প্রপঞ্চং যৎ প্রকাশতে।
তৎ ব্রহ্মাহমিতি জ্ঞাত্বা সর্ববন্ধৈঃ প্রমুচ্যতে।
(কৈবল্যোপনিষৎ ১৭)

জাগ্রদাদি অবস্থায় যে প্রপঞ্চ প্রকটিত তাহা ব্রহ্মস্বরূপ, আমারই স্বরূপ এই জানিলে সর্ব্ববন্ধন ছিন্ন হয়।

ময্যেব সকলং জাতং ময়ি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং।
ময়ি সর্ব্বং লয়ং যাতি তদ্ব্রহ্মাদ্বয়মস্ম্যহম্" ॥
(কৈবল্যোপনিষৎ ১৯)

জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি অবস্থায় যিনি জগৎপ্রপঞ্চ প্রকাশ করেন তাহা ব্রহ্ম, তিনি আমিই হই। এইটী জানিলে সকল বন্ধন টুটিয়া যায়। জগৎ আমা হইতে উৎপন্ন, আমাতে প্রতিষ্ঠিত, আবার আমাতেই লয় পাইবে। আমিই সেই ব্রহ্ম।

আকাশে কত বিচিত্র ধর্ম্মের রামধনু উঠিয়াছে। সূর্য্য কিরণের প্রতিবিম্ব ফলিত হওয়াতেই উহাদের ঐরূপ দেখাইতেছে। ইহা শুধু দৃষ্টি বিভ্রম। মেঘ যেরূপ আকাশকে আবৃত করিয়াছে, অনন্ত

ব্রহ্মও সেইরূপ মায়ামেঘে আবৃত। মেঘ সরিয়া গেলে এক মহান্ আকাশ দেখা যায় ; মায়ামেঘ অপসারিত হইলে তেমনি স্বয়ম্প্রভ ব্রহ্ম প্রকাশিত হন।

(ব্রহ্মাভ্যাস জন্য বিচার প্রণালী।)

এইরূপে বিচারদ্বারা সকল চিন্তাকেই ব্রহ্মোন্মুখী করা আবশ্যক। বিষয় কার্য্যেব সঙ্গে সঙ্গেও বিচার করিতে হইবে।

হরিদ্বাবের বানরগুলির বল ও সাহস অপরিসীম। কেহ খাইতে বসিলে তাহারা দল বাঁধিয়া সেখানে উপস্থিত হয় ও বড় উৎপাত করে। এ জন্য সাধুবা আহারের পূর্ব্বে আশ্রমস্থ বাগান হইতে বানর তাড়াইয়া আসেন। একদিন ঠাকুর স্বয়ং ধনুক হস্তে বানর তাড়াইতে যাইতেছেন এমন সময়ে জনৈক ভক্ত তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলে, ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, 'যাও, নিজের বাগান হইতে বানর তাড়াইয়া আইস'। শিষ্য এই কথায় বিস্মিত হইলে ঠাকুর বলিলেন, 'তোমার দেহরূপ বাগানে ইন্দ্রিয় বানর বড অশান্তির সৃষ্টি করিতেছে, বিবেক-ধনুর দ্বারা তাহাদের শান্ত করিয়া জ্ঞানামৃত ভক্ষণ কর'।

একদিন বালি দিয়া গৃহের ভিটা সমান করাইতে করাইতে ঠাকুর বলিলেন, 'ইন্দ্রিয়াদিজনিত হর্ষ ও অমর্ষ এইরূপে বিবেক বিচার দ্বারা সমতা প্রাপ্ত হইলে সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি জন্মে। "সমত্বং যোগ উচ্যতে" (গীতা) সমবুদ্ধি হইলেই ব্রহ্মযোগ।

আর একদিন, কয়েকজন শিষ্য বাগানের নানা স্থান হইতে কতক গুলি কাঠ কুড়াইয়া আনিয়া এক জায়গায় স্তূপ করিলেন। তখন ঠাকুর বলিলেন, 'এখন পুরস্কার লও'। সকলে হাসিয়া দাঁড়াইলে বলিলেন, 'এই কাঠগুলি কুড়াইয়া আনায় এখন বাগানটী পরিষ্কৃত

হইয়াছে। এখন উহাতে চাষ আবাদ চলিবে। তোমাদের দেহস্থিত বৃত্তি গুলিও এইরূপ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। উহাদিগকে কুড়াইয়া আনিয়া এক ব্রহ্মাভ্যাসে নিযুক্ত কর। উহাতে হৃদয় কানন পরিষ্কৃত হইবে ও তখন উহাতে অধ্যাত্ম বিদ্যার বীজ বুনিবার বেশ সুবিধা হইবে।

"মন তুমি কৃষি কাজ জাননা
এমন মানবজমিন্ রইল পতিত
আবাদ করলে ফল্‌ত সোনা।"

এই গানেও রামপ্রসাদ উক্ত আবাদের ঝঙ্কার দিযাছেন।

অপর দিন এক ব্যক্তি আসিয়া মোকদ্দমার প্রসঙ্গ তুলিল। তখন ঠাকুর উপস্থিত শিষ্যদিগকে বলিলেন, এই ত উকিল, ব্যরিষ্টার, হাকিম, জমি ও জমা প্রভৃতির আলোচনা হইল। কিন্তু এ ত বিষয়ালাপের স্থান নহে। এইরূপে বিবেক হাকিমের এজ্‌লাসে 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা,' এই সম্পর্কে মোকদ্দমা কর। বাদীপক্ষ জ্ঞান, বৈরাগ্য তাহার উকিল। দেখিবে, সত্যেরই জয়, অজ্ঞান হারিয়াছে। এইরূপ দৃষ্টান্ত অনুসরণে সকল বিষয়ের ব্রহ্মে পরিসমাপ্তি করার অভ্যাসই ব্রহ্মাভ্যাস এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্কার ধ্বংসের প্রকৃষ্ট উপায়।

দশম বল্লী।

(অধিকারী ভেদে উপদেশ।)

অধিকারী ভেদে ব্যবহারে সর্ব্ব শ্রুতি বাক্যের সার্থকতা। নতুবা সর্ব্ব শ্রুতি সকলেরই সর্ব্বকালে উপযোগী মনে করিলে, বহু অনর্থপাতের সম্ভাবনা। শ্রুতিবাক্যের দোহাই দিয়া দেহই আত্মা, ইন্দ্রিয়ই আত্মা, মনই আত্মা, বুদ্ধিই আত্মা, আনন্দময়কোষই আত্মা, পুত্রই আত্মা ইত্যাদি বহু মতের সৃষ্টি হইয়াছে।

সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোক সংগ্রহম্ ॥
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥

(গীতা ৩।২৫।২৬)

কর্ম্মে আসক্ত অজ্ঞানীরা যেরূপ করিয়া থাকে, কর্ম্মে অনাসক্ত জ্ঞানীগণও লোকদিগকে স্ববর্ণোচিত ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে ইচ্ছুক হইয়া, সেইরূপ করিবেন। অজ্ঞ কর্ম্মাসক্তদিগের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবেন না। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ নিজে সকল কার্য্যে অনুষ্ঠিত থাকিয়া, অজ্ঞদিগের অন্তঃকরণ নির্ম্মল না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদিগকে কর্ম্মে নিয়োজিত রাখিবেন।

গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে, ভগবান্ স্বয়ং জ্ঞানের অনধিকারী নির্ব্বাচন করিয়াছেন।

"ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন ;
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি" ॥

(গীতা ১৮।৬৭)

হে অর্জ্জুন! স্বধর্ম্মানুষ্ঠানহীন, ভক্তিহীন, গুরুশুশ্রূষাবিহীন ও ভগবানের নিন্দাকারীকে কখনও এই গীতার তত্ত্বার্থ বুঝাইও না।

তথাচ,—

"রাজ্যং দেয়ং ধনং দেয়ং যাচতঃ কামপূরণম্।
ইদমষ্টোত্তরশতং ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ" ॥

(মুক্তিকোপনিষৎ ৪৩)

রাজ্য, ধন, সব চাহিলে দিবে। কিন্তু, ব্রহ্মবিদ্যা-সম্বলিত এই ১০৮টী উপনিষৎ যাকে তাকে দিবে না। বিভিন্ন শ্রুতিবাক্য যে, দেশ, কাল, ও পাত্রভেদে প্রযোজ্য তাহা তৈত্তিরীয়োপনিষদের ভৃগুবল্লী ও ছান্দোগ্যের সনৎকুমার-নারদ সংবাদ পাঠ করিলে জানা যায়। ভৃগু কিছুকাল তপস্যা করিয়া, পিতা বরুণের নিকট উপস্থিত হইয়া, ব্রহ্ম বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন। পিতা বলিলেন, "অন্নং ব্রহ্ম ইতি ব্যজানাৎ"। আরও কিছুদিন সাধনা করিয়া যখন ফিরিলেন, তখন পিতা উত্তর করিলেন "প্রাণো ব্রহ্ম ইতি"। এইরূপে বারংবার তপস্যার ফলে ভৃগুর মন যতটুকু পাইবার উপযোগী হইত, পিতা তাহাকে সেই পরিমাণ শিক্ষা দিতেন। ভৃগুর ন্যায় নারদকেও সনৎকুমার ক্রমে মন, বুদ্ধি, আনন্দময় কোশ প্রভৃতি শিখাইয়া সর্ব্বশেষে ব্রহ্ম উপাসনা বুঝাইয়া দেন।

একই উপদেশ যে অধিকারী ভেদে বিভিন্ন মতের সৃষ্টি করে, সে বিষয়ের দৃষ্টান্তের অভাব নাই। বৃহদারণ্যকের পঞ্চম অধ্যায়ে কীর্ত্তিত হইয়াছে যে, দেব, মনুষ্য ও অসুর মিলিয়া প্রজাপতির নিকট ব্রহ্মচর্য্য সম্পর্কে উপদেশ প্রার্থণা করিলে, তিনি তাঁহাদিগকে "দ" শব্দটির

উপদেশ করেন। দেবতাগণ "দ" শব্দ অর্থে 'দম', মানুষ 'দান', আর অসুর 'দয়া'—ইহা বুঝিয়াছিলেন। ইন্দ্র ও বিরোচন উভয়ে একই সময়ে প্রজাপতির নিকট ব্রহ্ম তত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞানলাভ করেন। বিরোচন অন্নময় কোশকেই আত্মা বিবেচনা করিয়া নিশ্চিন্ত হন, কিন্তু ইন্দ্র পাঁচ বারে প্রায় এক্ শতাব্দীর সাধনাফলে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়া কৃতার্থ হন। মার্কণ্ডেয় চণ্ডী সপ্তশতী বলিয়া সর্ব্বত্র সুপরিচিত। মেধস মুনি এই সপ্ত শতী, রাজা সুরথ ও সমাধি নামক এক বৈশ্য উভয়ের নিকটই বলেন। রজোগুণের প্রাবল্যে রাজা সুরথ দেবীর অর্চ্চনা করিয়া হৃতরাজ্য লাভ করিলেন। আর সত্ত্বগুণাশ্রিত বৈশ্য সমাধি সন্ন্যাস গ্রহণে জ্ঞানলাভ করিলেন।

"জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্‌জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্" ॥
(গীতা ৫।১৬)

যিনি জ্ঞানের সাধনায় অজ্ঞান নষ্ট করিয়াছেন, প্রভাকররূপী স্বনম্প্রভ ব্রহ্ম তাঁহাতেই প্রতিভাত।

"স্বপ্রবোধং বিনা নৈব স্বস্বপ্নো হীয়তে যথা।
অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্বে স্বপ্নোহয়মখিলং জগৎ" ॥

এ জীবন নিশার স্বপন। প্রভাতসূর্য্যের আবির্ভাবে অজ্ঞান ঘুম ভাঙ্গিলেই এ স্বপ্নের অলিকত্ব উপলব্ধি করা যায়। ইহাই বেদান্তশাস্ত্রের তাৎপর্য্যার্থ।

(সৃষ্টি তত্ত্ব।)

জগতের সৃষ্টি সম্পর্কে ব্রহ্ম শুধু হেতু-স্বরূপ। সূর্য্যকিরণের তৃণাদি দাহিকা শক্তি সামান্যতঃ নাই, কিন্তু কাচে প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব দ্বারা

তৃণ দাহন করা যায়। এইরূপ, ব্রহ্ম মায়াশক্তিতে প্রতিবিম্বিত হইলে মায়ার পরিণামে জগৎপ্রপঞ্চ উৎপাদিকা শক্তি জন্মে। ইনি মহত্তত্ত্বে প্রতিবিম্বিত হইলে জগৎ সৃষ্ট হয়। প্রতিবিম্ব যেরূপ মিথ্যা, জগৎও সেইরূপ মিথ্যা। দর্পণে মুখ দেখিয়া যেরূপ নিজের মুখখানি বিস্মৃত হই, এই জগৎ দেখিয়াও সেইরূপ প্রকৃত চিৎ পদার্থটীকে ভুলিয়া যাই। মায়া নিত্য কি অনিত্য তাহা নির্ব্বাচনের অযোগ্য বলিয়া ইহাকে অনির্ব্বচনীয়া বলে। এই মায়া ত্রিগুণাত্মিকা। গুণের সাম্যাবস্থা, প্রকৃতি-লীন অবস্থা। গুণ বৈষম্যই সৃষ্টি। সত্ত্ব প্রধানা প্রকৃতি মায়া, আর রজস্তমপ্রধানা প্রকৃতি অবিদ্যা। মায়া উপাধি বিশিষ্ট ব্রহ্ম প্রতিবিম্ব ঈশ্বর, আর অবিদ্যা উপাধি বিশিষ্ট ব্রহ্ম প্রতিবিম্ব জীব।

"মায়াবিম্বো বশীকৃত্য তাং স্যাৎ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ"।
অবিদ্যাবশগস্ত্বন্যস্তদ্বৈচিত্র্যাদনেকধা।
সা কারণশরীরং স্যাৎ প্রাজ্ঞস্তত্রাভিমানবান্" ॥

(পঞ্চদশী ১।১৬।১৭)

মায়া-প্রতিবিম্বিত ব্রহ্ম ঈশ্বর। ইনি সর্ব্বজ্ঞ। অবিদ্যা-প্রতিবিম্ব জীব বৈচিত্র্যময়। অবিদ্যা কারণ শরীর, আর অবিদ্যাভিমানী জীব প্রাজ্ঞ। সূক্ষ্মশরীরাভিমানী জীব তৈজস, আর স্থূল শরীরাভিমানী জীব বিশ্ব। অব্যাকৃতা মায়া ঈশ্বরের দেশ, সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় তাঁহার কাল, আর গুণত্রয় তাঁহার পাত্র। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই অবস্থা-ভেদে ঈশ্বরের ক্রমে বিরাট, হিরণ্যগর্ভ ও অব্যাকৃত এই তিনটী শরীর কল্পিত হয়। অবস্থাত্রয় জীবের কাল; অন্তঃকরণ তাহার দেশ; আর স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর তাহার পাত্র বা ভোগসামগ্রী।

রাজা দুর্য্যোধন ময়দানব নির্ম্মিত স্ফটিক আবাসে প্রবেশ করিয়া আত্মহারা হইয়াছিলেন। "কাচভূমৌ জলত্বং বা জলভূমৌ হি কাচতা"।

মরুভূমিতে যেরূপ জলভ্রম হয়, আকাশে যেরূপ নীলিমাভ্রম হয়—ব্রহ্মে ও সেইরূপ জগৎ ভ্রম জন্মে। জীব ও ঈশ্বর উভয়েই ব্রহ্মচৈতন্যে চৈতন্য-ময়। জীব অল্পজ্ঞ বলিয়া নিজকে ঈশ্বর হইতে পৃথক্ মনে করে। 'তত্ত্বমসি', মহাবাক্যদ্বারা এই পার্থক্য নিরাকৃত হইয়াছে। তৎ+ত্বম্+অসি—সেই (ঈশ্বর) তুমি। সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা ব্রাহ্মণ আর নিরক্ষর চণ্ডাল উভযেই যেরূপ মানুষ, হীরক ও অঙ্গার যেমন একই পদার্থ—ঈশ্বর এবং জীবও সেইরূপ এক ব্রহ্ম-প্রতিবিম্ব।

একাদশ বল্লী

(মায়ার আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তি।)

জীব ও ঈশ্বর মায়ার আবরণে আবৃত হইয়া ব্রহ্ম সহ নিজের অভেদ ভাব বুঝিতে পারে না। মধ্যাহ্নের প্রখর সূর্য্যকেও মেঘ ঢাকিয়া ফেলে। পানায় ঢাকা পুকুরের জল প্রথমতঃ দেখা যায় না, কিন্তু পানা ফেলিয়া দিলে নির্ম্মল জল দৃষ্ট হয়। সূর্য্য চিরপ্রকাশ, কিন্তু যতক্ষণ পৃথিবীর ছায়া উহাকে ঢাকিয়া রাখে অবোধ লোকেরা ততক্ষণ উহার অস্ত কল্পনা করে।

"ঘনচ্ছন্নদৃষ্টি র্ঘনচ্ছন্নমর্কং যথা নিষ্প্রভম্মন্যতে চাতিমূঢ়ঃ।
তথা বদ্ধবদ্ভাতি যো মূঢ়দৃষ্টেঃ স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা" ॥
(হস্তামলক।)

মুগ্ধ জীব 'আমি সেই আত্মা' এই কথাটী ভুলিয়া নিজকে বদ্ধ মনে করে। মায়ার আবরণে বদ্ধ থাকায় জীবের কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি অলীক ভাবনা উপস্থিত হয়।

বিক্ষেপ শক্তির প্রভাবে অজ্ঞানাবৃতা বুদ্ধি আকাশাদি মরজগতের সৃষ্টি করে। নানাত্ব কল্পনা ও বৈচিত্র সৃষ্টি, ইহার কার্য্য। "বিক্ষেপ-শক্তির্লিঙ্গাদিব্রহ্মাণ্ডান্তং জগৎ সৃজেৎ"। বিক্ষেপ শক্তি লিঙ্গ শরীর হইতে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত জগতের সৃষ্টি করে। বিভিন্ন মেঘ নানা ভাবে অবস্থান করায় সূর্য্য কিরণ উহাদের মধ্যে বিভিন্ন ভাবে প্রতি-ফলিত হয় এবং নানাবর্ণের সৃষ্টি করে। যেমন বায়স্কোপের গ্যালারিব বিজলী বাতি জ্বালাইলে, দর্শকের অন্ধকারাবরণ না থাকায়, বায়স্কোপের খেলা বন্ধ হয়। বায়স্কোপের খেলা দেখিতে গ্যালারী অন্ধকারে আবৃত রাখা দরকার। ঐরূপ মায়ার আবরণ শক্তি তম, আর বায়স্কোপের খেলা বিক্ষেপ শক্তির ক্রিয়া। গ্যালারিতে যখন বিজলি বাতি থাকে, তখন দর্শক স্বস্বরূপে স্থিত। বাতি নিবাইলে অন্ধকারে আবৃত হইয়া, বিক্ষিপ্তচিত্তে খেলা দেখে। সৎগুরু যদি গ্যালারির বিজলি বাতি জ্বালান তবে পুনঃ স্বরূপে অবস্থান হয়। এই দুই শক্তির মধ্যে আবরণ শক্তির বিনাশ হইলে অপরটী আপনা হইতেই বিলীন হইয়া যায়। 'ব্রহ্মৈবাহমস্মি'—আমিই ব্রহ্ম, এই জ্ঞান জন্মিলেই ঐ আবরণ শক্তি ছিন্ন হয়।

"আবরণস্য নিবৃত্তি র্ভবতি চ সম্যক্ পদার্থ দর্শনতঃ।
মিথ্যাজ্ঞান বিনাশস্তদ্ বিক্ষেপ জনিত দুঃখনিবৃত্তিঃ ॥"

ব্রহ্মদর্শন ঘটিলে আবরণশক্তি নিবৃত্ত হয়। মিথ্যাজ্ঞান এবং তদুৎপন্ন বিক্ষেপ জনিত দুঃখও এই সময় নিবৃত্ত হয়।

মাকড়সা যেমন নিজের দেহ হইতেই লূতাতন্তু সৃষ্টি করিয়া জাল বুনে এবং তাহারই আশ্রয়ে আবার নিজে বাস করে, তেমনি, ঈশ্বর জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। জগৎ তাঁহারই সৃষ্টি, আবার তাঁহারই লীলানিকেতন।

"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।"

(গীতা—১৫।৭)

জীব তাঁহারই অংশ। স্বয়ম্প্রভ সূর্য্যের প্রতিবিম্ব যেমন মরুভূমে পথিকের চক্ষে জলাশয়ের ধাঁধা সৃষ্টি করে, স্বপ্রকাশ ব্রহ্মপ্রতিবিম্বও তেমনি অন্তঃকরণ রূপ মরুতে এই বিশ্ব প্রপঞ্চের সৃষ্টি করে। মরীচিকায় জল নাই। শুধু একটা তেজোময় আবরণে চক্ষু ঝল্‌সিয়া গিয়া জলের ভ্রম জন্মায়। এই দৃশ্যপ্রপঞ্চও সেইরূপ অস্তিত্ব বিহীন, অজ্ঞানাবরণে ঐরূপ প্রতীত হয়। একই সূর্য্য যেরূপ নানা পদার্থে, নানা ভাবে প্রতিভাত হয়, এক ব্রহ্মও সেইরূপ নানা বুদ্ধিতে নানারূপে প্রতিফলিত হইয়া বহুত্বের সৃষ্টি করে। মায়ার বিক্ষেপ শক্তি দ্বারাই এই বহু বুদ্ধির অবতারণা।

(জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয় অবস্থা।)

সাধারণতঃ মানুষ জাগ্রত, স্বপ্ন, ও সুষুপ্তি এই তিনটি অবস্থা লইয়াই ব্যস্ত থাকে। স্বর্গাদি উপভোগও ইহাদের অন্তর্ব্বর্ত্তী। এই টুকু মাত্র প্রভেদ যে ইহার উপভোগ সূক্ষ্ম বা লিঙ্গদেহ দ্বারা হয়। এই লিঙ্গদেহ—পঞ্চ প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়দশক সহ—সপ্তদশ কলায় গঠিত। অবস্থাত্রয় ইহারই উপভোগ্য। এতদতিরিক্ত আর

একটী অবস্থা আছে। উহা তুরীয় বা চতুর্থ অবস্থা। তাহা ইন্দ্রিয়াতীত, জ্ঞানগম্য ; সমাধিমগ্ন যোগীর উপভোগ্য। এই অবস্থায় না পঁহুছিলে ব্রহ্ম এবং মায়ার পার্থক্য অনুভব করা যায় না। সূতায় একটুকু আঁশ থাকিলেও যেমন তাহা ছুঁচে প্রবেশ করিতে পারে না, অন্তরেও তেমনি বিষয় বাসনার লেশ মাত্র থাকিলে, তাহা মায়ার অপর পারে পঁহুছিতে পারে না। সমাধিযোগেই জীব, ঈশ্বর ও ব্রহ্মের একত্ব অনুভূত হয়। এস্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, অদ্বৈতাত্ম-দর্শন ব্যতীত শুধু নির্ব্বিকল্প সমাধি দ্বারা পূর্ণানন্দ প্রাপ্তি ঘটে না। এই চতুর্থ অবস্থা মুমুক্ষু জীবের একমাত্র লক্ষ্যস্থল। শুধু বিচার ও বৈরাগ্য দ্বারাও জ্ঞান লাভ সম্ভব কিন্তু তাহা দীর্ঘ ব্রহ্মাভ্যাস সাপেক্ষ। সমাধি তদপেক্ষা সুগম বটে। দেহাত্ম বুদ্ধিতে মজিয়া থাকাই পাপ।

"দেহাত্মবুদ্ধিজং পাপং ন তদ্বৎগোকোটিবধঃ।
আত্মাহংবুদ্ধিজং পুণ্যং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥"

দেহ কে আমি বলিয়া মনে করা এত পাপ যে কোটি গোবধেও তাহা হয় না। আব আত্মাকে আমি বলিয়া মনে করা—এত পুণ্য যে তার অধিক পুণ্য সম্ভবপর নহে।

(সৃষ্টির প্রাগবস্থা।)

প্রথমতঃ ঈশ্বর ছিলেন। জগৎ ছিল না। সেই অব্যক্ত অবস্থা ঈশ্বরের সুষুপ্তি অবস্থা।

"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্।
তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্, তস্মাদসতঃ
সজ্জায়তে।" (ছান্দোগ্য ৬।২।১)

হে সোম্য, উৎপত্তি পূর্ব্বে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সৎ স্বরূপই

ছিল। এবিষয়ে অপরে (বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ) বলেন যে, উৎপত্তির পূর্ব্বে এই জগৎ এক অদ্বিতীয অসৎ—অবিদ্যমান—অভাব—স্বরূপই ছিল অর্থাৎ কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না, তখন শুধু একমাত্র অভাবাত্মক শূন্যই বর্ত্তমান ছিল। সেই অসৎ বা অস্তিত্বহীন একান্ত অভাবাত্মক শূন্য হইতেই এই বিপুল বিচিত্র বিশ্বের উৎপত্তি হইযাছে।

(প্রকৃতি পুরুষ বিবেক।)

শ্রুতির উপরোক্ত অংশ হইতে জগৎ সৃষ্টি সম্পর্কে বিভিন্ন মতাবলম্বী ঋযিগণের উল্লেখ পাওয়া যায়। এইটুকু হইতেই ষডদর্শনের অবতারণা হইয়াছে। প্রকৃতিই জগৎ সৃষ্টি সম্বন্ধে কায্য, কারণ ও কর্ত্তা। এই কর্ত্তৃত্বের বিষয চিন্তা করিলে, অসদবস্থার প্রকৃতিই লক্ষিত হয়। তখন নিষ্ক্রিয পুরুযের বিষয় কল্পনাপথে আসে না। পূর্ব্বে একমাত্র অসৎ অর্থাৎ অব্যক্ত বা অমূর্ত্ত ছিল, এই অসৎ হইতেই ব্যবহারিক অনাদি সৎ, ব্যক্ত বা মূর্ত্ত অর্থাৎ ঈশ্বর বা সত্যাদি পঞ্চমহাভূত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ছিলেন। অন্য কিছু ছিল না বা নাই, ইহাই শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্যার্থ।

> "প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
> বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্॥
> কার্য্যকারণ কর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
> পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥"
>
> (গীতা ১৩।১৯।২০)

প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েই অনাদি। গুণত্রয় ও তাহাদের বিকৃতিসমূহ প্রকৃতিজাত। কার্য্য, কারণ ও কর্ত্তৃত্ব প্রকৃতির আয়ত্ত। পুরুষ প্রকৃতিস্থ.

হইয়া সুখ ও দুঃখের ভোক্তা হন। "অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যম্" (মুণ্ডক)। অন্ন হইতে প্রাণ, হিরণ্যগর্ভ, মন এবং পঞ্চভূত হইয়াছে।

লাল ফুলটীর কাছে থাকিলে স্ফটিকও লাল দেখায়। পুরুষও সেইরূপ সুখ দুঃখে ভোগের সাক্ষী মাত্র। প্রকৃত ভোক্তা লিঙ্গ শরীরস্থ বুদ্ধিবৃত্তি। সমাধিরত যোগীর দেহ যখন মৃত্তিকার স্তররাশি ঢাকিয়া ফেলে, তখন তাঁহার বুদ্ধি বিলীন অবস্থায় থাকে বলিয়া, দীর্ঘ সময় অতীত হইলেও সুখ দুঃখের উপলব্ধি হয় না।

সুষুপ্তির শেষে জাগরণহীন যে তন্দ্রাবস্থা, তাহাই স্বপ্নাবস্থা। এই সময়ে জাগ্রত অবস্থার বাসনা প্রভৃতি কার্য্য করিয়া থাকে। তুলা হইতে যেমন প্রথমতঃ সূতা, তারপব কাপড তৈয়ারী হয়, প্রকৃতি-লীন অবস্থার পরও তেমনি সৃষ্টির পূর্ব্ব মূহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ব্রহ্মার সূত্রাবস্থা। এই জন্য ইহার অপর নাম সূত্রাত্মা বা হিরণ্যগর্ভ। এই সময়ে সূক্ষ্ম শরীরস্থ সত্ত্বরজো গুণাংশের বিকাশ হয়। ইহার পর বিশ্বের প্রকাশ বা স্থূলদেহস্থ তামসাংশের সৃষ্টি। সূত্রের বস্ত্রে পরিণতি। এই সময়েই বিক্ষেপ শক্তির লীলায় বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়। বায়ুর গতি, বাষ্প, বিদ্যুৎ ও জলপ্রপাতের সাহায্যে কত কল কারখানা চলিতেছে। এই সমস্তই জড়ের কর্ত্তৃত্ব। "জড়োঽপি জড়ং চেষ্টয়ন্ লোকে দৃশ্যতে যথা।" এই জগতে জড় দ্বারা জড় চালিত হয়। চুম্বক, বৈদ্যুতিক শক্তি প্রভৃতি সমস্তই জড় এবং প্রকৃতিরই শক্তি।

তুরীয় অবস্থায় মায়ারহিত ব্রহ্মচৈতন্যের বিকাশ। ইহা বাক্য মনের অগোচর, গুরু-অধিগম্য এবং স্বানুভূতির বিষয়। এই অবস্থায় পৌঁছিলেই মনুষ্য জীবনের সার্থকতা—পুরুষার্থসিদ্ধি এবং মোক্ষলাভ। গুরুকৃপায় এই অবস্থায় উপনীত হইলেই—'অহং ব্রহ্মাঽস্মি', 'অয়মহমস্মি' বা 'সোঽহং ভাব। তখন সচ্চিদানন্দরূপে স্থিতি।

"ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং বিমুক্তোঽহং ভবগ্রহাৎ।
নিত্যানন্দস্বরূপোঽহং পূর্ণোঽহং ত্বদনুগ্রহাৎ॥"

(বিবেক চূড়ামণি, ৪৯০)

তখন চিত্ত নির্ভীক, প্রশান্ত। 'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন'—ব্রহ্মানন্দকে পাইলে আর পুনর্জ্জন্মাদির ভয় থাকে না।

"জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈঃ জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ।
তস্যাভিধানাৎ তৃতীয়ং দেহভেদে বিশ্বৈশ্বর্য্যং কেবল আপ্তকামঃ॥"

ইহাই জীবের শিবত্ব প্রাপ্তি।

দ্বাদশ বল্লী।

(জীবই শিব।)

"ন শাস্তা ন শাস্ত্রং ন শিষ্যো ন শিক্ষা।
ন চ ত্বং ন চাহং ন চায়ং প্রপঞ্চঃ॥
স্বরূপাববোধাদ্ বিকল্পাসহিষ্ণু।
স্তদেকোঽবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোঽহম্॥" (নির্ব্বাণদশক ৮)

তথায় শাস্তা, শাস্ত্র, শিষ্য, শিক্ষা নাই। তুমি, আমি বা এই প্রপঞ্চ নাই। কোন কল্পনা চলে না। নেতি নেতি বিচারে, স্বরূপ জ্ঞানে যে এক অবশিষ্ট থাকে সেই কেবলাবস্থায় আমিই শিব বা পরমাত্মা।

ব্রহ্মই সত্য, জগৎ একেবারে মিথ্যা,—এই কথাটি প্রথমতঃ এমনই অসংলগ্ন বলিয়া বোধ হয় যে, উহা সাধারণ জীবের পক্ষে বিশ্বাসের যোগ্য হয় না। ব্রহ্মচর্য্য, বিচার, বৈরাগ্য ও ক্রম-অভ্যাস দ্বারা এই জ্ঞান মিলে। এজন্য প্রথমতঃ গুরু ও বেদান্ত বাক্যে অন্ধ বিশ্বাস রাখিয়াই অগ্রসর হইতে

হয়। বিশ্বাস ভারী সহায়। ৺কাশীধামে মৃতদেহ বহন কালে বহু ব্যক্তি শবোপরি পুষ্পাঞ্জলি বর্ষণ পূর্ব্বক 'শিবায় নমঃ'বলিয়া উহার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। অনুসন্ধান করিলে জানা যায়, তাঁহারা শাস্ত্রবাক্যে নির্ভর করিয়া ঐরূপ করিয়া থাকেন। শাস্ত্রে আছে, ৺বারাণসীতে মৃত্যু ঘটিলে শিব স্বয়ং তাহার দক্ষিণ কর্ণে ব্রহ্ম নাম দেওয়ায় তাহার শিবত্ব প্রাপ্তি হয়। সেই শিবকেই তাঁহারা অর্চ্চনা করেন—মৃতদেহকে নয়।

"যত্র কুত্রাপি বা কাশ্যাং
মরণে স মহেশ্বরঃ।
জন্তোর্দক্ষিণ কর্ণে তু
মন্ত্রারং সমুপদিশেৎ॥"
(মুক্তিকোপনিষদ্—১৯)

(স্থূল, লিঙ্গ ও কারণ শরীর।)

যাহার শিবত্ব ঘটে তাহার সূক্ষ্ম শরীর, দেহত্যাগ করিলেও দেহ দাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, সংস্কার বশে ঐ দেহের নিকটে থাকে। ইহা সেই সূক্ষ্মশরীরের অর্চ্চনা ইহাতে বুঝা যায় যে, এই পিণ্ডকে তাঁহারা পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতের পিণ্ড বলিয়াই জানেন। ইন্দ্রিয়াতীত সূক্ষ্মদেহে বিশ্বাস করিয়াই তাঁহারা এরূপ করিয়া থাকেন। আর্য্যগণ দেহকে মাংসাদির পিণ্ড ছাড়া আর কিছু মনে করেন না। দেহান্তে ঘাটে যে পিণ্ডাদি প্রদত্ত হয় ও যাহাতে "ইদং নীরং, ইদং ক্ষীরং, স্নাত্বা, পীত্বা, সুখী ভব"—বলিয়া প্রার্থনা করা হয়, তাহাও লিঙ্গ দেহাত্মক জীবাত্মার উদ্দেশ্যেই করা হয়। দেহের সহিত জুতা জামার সম্পর্ক যেরূপ ক্ষণিক, জীবাত্মার সহিত দেহের সম্পর্কও সেইরূপ ক্ষণিক। এক স্থূলশরীর ভাঙ্গিলে অন্য স্থূলশরীর ব্যবহৃত হয়।

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়।
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি ॥
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা।
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥" (গীতা ২।২২)

এই লিঙ্গ শরীর থাকাতেই জীবেব সংসারে পুনঃ পুনঃ আসা যাওয়া হইয়া থাকে। এই শরীরই গাঢ় নিদ্রাকালে অচেতন হয়। তখন সাক্ষী স্বরূপ তদতিরিক্ত আত্মা বিরাজিত থাকেন। ইহা বিচাব দ্বারা জানা যায়। লোকে কথায় বলে, পূর্ব্ব জন্মের পাপে বা পুণ্যে ইহজন্মের সুখ দুঃখ এবং পারত্রিক মঙ্গলের জন্য কতই না অনুষ্ঠান আবশ্যক। ইহাতেই বুঝা যায় যে, লোকে জানে যে, সে তিনকালেই বিদ্যমান। আমি আত্মা, অজর, অমর ইহা বুঝিযাও সে দেহত্রয়কে স্বপ্নবৎ ক্ষণিক বলিয়া বিশ্বাস করিতে চায় না। আমি মরিব—এই ভয়েই অস্থির। কি মোহ! লোকে বলে, প্রাণ যায় ত রক্ষা পাই। অর্থাৎ প্রাণ এই দেহ ছাড়িয়া লিঙ্গশরীর সহ যে নূতন শরীর গ্রহণ করিবে, তাহা এই ভোগায়তন শরীর হইতে ভাল হইবে, ইহাই তাহার আশা—নতুবা এ কথার কোন সার্থকতা থাকে না। লিঙ্গ শরীর থাকিতে প্রাণ, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, মন বা বুদ্ধির ধ্বংস নাই। সুতরাং এই সুখ দুঃখেরও ধ্বংস হয় না। জ্ঞান হইলে লিঙ্গ ও কারণ দেহ বিলীন হয়, সুখ দুঃখও ঐ সঙ্গে অন্তর্হিত হয়। তখন কেবলানন্দ উপভোগ, পরম শান্তি লাভ। জ্ঞানে আশার পরিতৃপ্তি, আনন্দের পূর্ণতা।

(ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী।)

"পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥" (বৃহদারণ্যক শ্রুতি)

'অদঃ' অর্থাৎ যাহা পরোক্ষ, দৃশ্যাতীত, অব্যক্ত ও নিরুপাধিক, তাহা ব্রহ্মে পূর্ণ ব্যাপ্ত। 'ইদম্' অর্থাৎ অপরোক্ষ, দৃশ্য, ব্যক্ত, সোপাধিক, নামরূপাদি ব্যবহারযুক্ত যাহা কিছু, তাহাও ব্রহ্মে ব্যাপ্ত। এই যে 'ইদম্' বা কার্য্যাত্মক ব্রহ্ম—তাহা পূর্ণ। কারণাত্মক ব্রহ্ম তাহা হইতে উৎক্ষিপ্ত হয়। উদচ্যতে অর্থাৎ উদ্রিচ্যতে বা উদ্গচ্ছতি। কার্য্যাত্মক ব্রহ্মের পূর্ণত্বকে গ্রহণ করিয়া ও আত্মস্বরূপ রসের আশ্রয় লইয়া, বিদ্যার সাহায্যে—অবিদ্যাকৃত ভূতমাত্র উপাধিসংস্পর্শজ অন্যত্বাবভাসকে তিরস্কার করিয়া—পূর্ণই অনন্তর, অবাহ্য, প্রজ্ঞান-ঘন, একরস-স্বভাব, কেবল-ব্রহ্মরূপে অবশিষ্ট থাকে। 'ইদম্' 'ত্বং', 'অদঃ' 'তৎ'। 'ত্বং' তৎ অসি'—'পূর্ণং ব্রহ্ম অসি'। 'ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ'—এই স্থলে ব্রহ্ম শব্দ দ্বারা 'পূর্ণমদঃ' বুঝাইতেছে। উহা হইতে কার্য্যাত্মক ব্রহ্ম অবভাসিত হয়। 'অহং অদঃ পূর্ণং ব্রহ্মাস্মি।' অবিদ্যাকৃত অপূর্ণস্বরূপ কার্য্যব্রহ্মকে তিরস্কার করিয়া ব্রহ্মবিদ্যার্জ্জিত পূর্ণব্রহ্ম কেবলানন্দ অবশিষ্ট থাকেন। তাহা ও ইহা দৃশ্যদৃশ্যাত্মক। কার্য্যব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্বাদি রূপ যে পূর্ণত্ব তাহা অবভাস মাত্র। পূর্ণত্ব তাহার স্বরূপ। পূর্ণের পূর্ণতাকে লাভ করিলে কার্য্যব্রহ্ম তৎসৃষ্টিগত হয়। তখন কেবল পূর্ণানন্দই অবশিষ্ট থাকে। মতান্তরে, বর্ত্তমানে দৃশ্য জগৎ ও অদৃশ্য—তাবতই সেই ব্রহ্ম কর্ত্তৃক পূর্ণ। ভূতকালে সৃষ্টির পূর্ব্বে তাহাতেই পূর্ণ ছিল ও সৃষ্টিকালে পূর্ণব্রহ্ম হইতে কার্য্যব্রহ্ম উৎক্ষিপ্ত হন। এবং প্রলয়ের কালে, ভবিষ্যতে অর্থাৎ লয়ে কার্য্যব্রহ্ম হইতে তাহার পূর্ণত্ব গ্রহণ করিলে, পূর্ণব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন।

ইক্ষুদণ্ড মিষ্ট। উহার রস জ্বাল দিলে যে গুড় প্রস্তুত হয় তাহা মিষ্ট। গুড় হইতে সংস্কৃত চিনিও মিষ্ট। আবার মিছিরি ততোধিক মধুর। এ মিষ্টত্বে টক্ ঝাল ইত্যাদি থাকিতে পারে না। যদি থাকে, তবে বুঝিতে হইবে যে, ইহা বাহিরের কোনও পদার্থের সংযোগে বিকৃত হইয়াছে।

এইরূপ ব্রহ্ম পূর্ণ, আর অখণ্ডসচ্চিদানন্দ-স্বরূপতাই তাঁহার কোন বিশেষত্বের একান্তাভাব। বেদান্তই সর্ব্ব সংশয় ছিন্ন করিয়া এই অদ্বৈত তত্ত্বে লইয়া যায়। যে পর্য্যন্ত দ্বৈতের লেশ থাকে, সে পর্য্যন্ত অদ্বৈতানন্দেব পূর্ণতা নাই। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন—"বেদান্তে সুপ্রতিষ্ঠোঽহং বেদান্তং সমুপাশ্রয়"। আমি বেদান্তে সুপ্রতিষ্ঠিত, অতএব বেদান্তেব আশ্রয় গ্রহণ কর।

(ব্যাবহারিক সত্ত্বা ও পারমার্থিক সত্ত্বা।)

যাহা বেদান্তবেদ্য তাহাই পারমার্থিক। তাহাতে নিমগ্ন থাকা অবস্থাই পারমার্থিক সত্ত্বা। তৎব্যতীত যাহা কিছু তাহাতে যতক্ষণ স্থিতি তাহা ব্যবহারিক সত্ত্বা।

জ্ঞানীগণের ব্যবহারিক সত্ত্বা ও পারমার্থিক সত্ত্বা মধ্যে, ত্রিগুণময়ী ব্যবহারিক সত্ত্বা "সর্ব্বলোক হিতায় চ", আর গুণাতীত পারমার্থিক সত্ত্বা সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন অধিকারীর উপকারার্থে প্রযোজ্য। নতুবা সর্ব্বকর্ম্ম-দগ্ধ জ্ঞানীর (স্বয়ং ব্রহ্মের) কর্ম্ম দ্বারা কি প্রয়োজন সাধিত হইবে? যিনি পূর্ণ হইয়া পূর্ণতাকে পাইয়াছেন তার আর অভাব কোথায়? প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানোৎপত্তি হইলে সেই জ্ঞানী ব্যক্তি বালক, পাগল বা পিশাচাদিবৎ থাকেন। সেজন্য তাঁহার আহার বিহারাদি দৃষ্টে অজ্ঞ জনের ভ্রম ধারণার সৃষ্টি করে। কিন্তু তাহাদের কোন অনুচিত কি গর্হিত কার্য্যে নিযুক্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। যেমন, নাচ্‌তে জান্‌লে বেতালে পা পড়ে না, তদ্রূপ। ব্যবহারিক সত্ত্বায় লোকশিক্ষার্থ কর্ম্মানুষ্ঠান। যেমন দেবতার উপাসনা, অর্থাদি সংগ্রহে লোক হিতকর ধর্ম্মশালা, পাঠশালাদি স্থাপন, দান, ধ্যান, তীর্থযাত্রাদি ও নিত্যক্রিয়া আহার বিহারাদি ইহাকেই গীতায় 'চিকীর্ষু লোকসংগ্রহং' বলা হইয়াছে। "যোজয়েৎ

সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্‌যুক্তঃসমাচরন্”। অর্থাৎ বিদ্বান্ (ব্রহ্মবেত্তা) স্বয়ং কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া, অজ্ঞানী লোকদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত রাখিবেন। তাহাদের বুদ্ধিভেদ জন্মাইতেও নিষেধ আছে—“ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।” কারণ বুঝিবার শক্তি না থাকায় অর্থাৎ অধিকারী না হওয়ায় তাহাতে তাহাদের সংশয় উপস্থিত হইয়া বিনাশের দিকে গতি হইবে। ‘সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।’

পারমার্থিক সত্তায় একমেবাদ্বিতীয, অসঙ্গ অখণ্ড, ব্রহ্ম আমি এইরূপ ভাবে অবস্থিত, ও সাধন চতুষ্টয়সম্পন্ন (আবৃত চক্ষু) অধিকারী অর্থাৎ মুমুক্ষুকে উক্ত জ্ঞানামৃতের ভাগী করা তাঁর কাজ। যাঁহারা আপ্তকাম, আত্মক্রীড় বা আত্মারাম তাঁহারা মূক, বধির, পাগল, পিশাচাদিবৎ থাকেন। আর যাঁহারা আচার্য্যত্বে নিযুক্ত তাঁহারা বেদ বিহিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম আচরণ করতঃ সমাজের উশৃঙ্খলতা নিবারণ করেন। যেমন ভগবান্ শঙ্করাচায্য প্রভৃতি।

(সর্ব্বঘটে এক চিৎ।)

একদা ভগবান্ শঙ্কর বারাণসীর দিকে অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময় বিশ্বনাথ তাঁহার পরীক্ষার্থ শ্বপচ বেশে সেই পথে ৺কাশী হইতে রওনা হইলেন। রাস্তাটী কণ্টকাকীর্ণ একপদী রাস্তামাত্র ছিল। উহার এমন স্থানে উভয়ের সাক্ষাৎ হইল যে, একজন সরিয়া না দাঁড়াইলে অপরের গাত্রে লাগিবারই আশঙ্কা। আচার্য্য দেখিলেন যে ব্রাহ্মণ বেশী তাঁহাকে দেখিয়াও, প্রচলিত প্রথাঁমতে শ্বপচ সরিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিবার কোন চেষ্টাই করিতেছে না। তখন তিনি বলিতে বাধ্য হইলেন “অরে রাস্তা ছেড়ে দে”। তাহাতে শ্বপদ বেশী মহাদেব পথ ছাড়িয়া না দিয়া বলিলেন—

"অন্নময়াদন্নময় মথবাচৈতন্যমেবচৈতন্যাৎ।
দ্বিজবর দূরীকর্ত্তুং বাঞ্ছসি কিং ব্রুহি গচ্ছ গচ্ছেতি ॥১
কিং গঙ্গাম্বুনিবিম্বিতেঽম্বরমনৌ চাণ্ডাল বাটীপয়ঃ।
পুরে চান্তরমস্তি কাঞ্চন ঘটীমৃৎ কুম্ভয়োধাম্বরে ॥
প্রত্যগ্‌বস্তুনি নিস্তরঙ্গ সহজানন্দাববোধাম্বুধৌ,
বিপ্রোয়ং শ্বপচোঽয়ামিত্যাপিমহান কোঽয়ং বিভেদভ্রমঃ ॥২
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু স্ফুটতরা যা সংবিদুজ্জৃম্ভতে,
যা ব্রহ্মাদি পিপীলিকান্ততনুসু প্রোতা জগৎ সাক্ষিণী।
সত্রবাহং নচ দৃশ্যবস্থিতি দৃঢপ্রজ্ঞাপি যস্যাস্তি চেৎ
চাণ্ডালোঽস্তু সতুদ্বিজেঽস্তু গুরুরিত্যোষাননীষা নম" ॥৩

ইত্যাদি।

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তুমি যে 'সরে যাও, সরে যাও' বলিতেছ তদ্দ্বারা কি দূর করিতে চাও? অন্নময় কোশ হইতে অন্নময় কোশকে? না, চৈতন্য হইতে চৈতন্য কে? অর্থাৎ, তোমার শরীর ও অন্নময় কোশ, আমারও তাই। কোন ভেদ নাই। আর যে চৈতন্য সেই অখণ্ড, একমেব। দূর করে কে কাকে? (১)

গঙ্গাজলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রে ও চাণ্ডালেব বাটিস্থিত জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রে কোন পার্থক্য আছে কি? সোনার ঘটে স্থিত আকাশে ও মৃত কলসীতে স্থিত আকাশে কোন পার্থক্য আছে কি? দেখ, হে মহাত্মা! তরঙ্গহীন স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানানন্দ স্বরূপ সমুদ্রে, আত্মা-রূপী পদার্থে এ বিপ্র, এ শ্বপচ ইত্যাদি প্রভেদ রূপ ভ্রম কেন? (২)

জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থা ত্রয়ে যে সংবিৎ (চৈতন্য) পরিস্ফুট ভাবে প্রতিভাত হয়, যাহা ব্রহ্মা হইতে তুচ্ছ পিপীলিকা পর্য্যন্ত অখিল শরীরে জগৎ সাক্ষী রূপে স্থিত, আমিও সেই সংবিৎ। দৃশ্য বস্তু মাত্র

অলীক তাহা "আমি" পদ বাচ্য নহে। এইরূপ যাঁহার দৃঢ় নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান আছে সে চণ্ডালই হউক্ আর দ্বিজই হউক তাঁহাতে আমার গুরু বলিয়া বিশ্বাস আছে। (৩)

শ্বপচ মুখে এমন জ্ঞানাত্মক বাক্য শ্রবণে আচার্য্য, আশ্চর্য্য হইয়া চিন্তা করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার অদ্বৈত জ্ঞান,—যাহা তিনি ভারত ব্যাপী প্রচারে নিযুক্ত ছিলেন—তাহা কতদূর দৃঢ় তাহার পরীক্ষার্থ স্বয়ং শঙ্কর শ্বপচ রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। তখন তিনি শ্বপচ বেশী শঙ্করকে অর্চ্চনা করতঃ বারাণসী প্রবেশ করিলেন।

পারমার্থিক সত্তায় ভেদ বুদ্ধির লেশ থাকে না। তথায় ব্রহ্মই ব্রহ্ম। জাতি, নাম, রূপ, বর্ণের, সংস্থান নাই। জ্ঞানীর কোন লিঙ্গ নাই, আচার ব্যবহারের বিধি নিষেধ নাই, তিনি তৎ সমুদায়ের বহির্ভূত। ব্যবহারিক সত্তায় লোকহিতার্থে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাদি আচরণ বাহ্যিক মাত্র। পারমার্থিক সত্তায় 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' অর্থাৎ এই দৃশ্যপ্রপঞ্চাদি সমস্তই ব্রহ্ম। তখন "হরিরেব জগৎ জগদেব হরি হরিতো জগতো নহি ভিন্ন তনুঃ"। ব্যবহারিক সত্তায়,—

"সক্তাঃ কর্ম্মণ্য বিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথা সক্তশ্চিকীর্ষু র্লোক সংগ্রহম্॥"

(গীতা ৩।২৫)

অবিদ্বান্ (অজ্ঞ) আসক্ত চিত্তে যে কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে, হে ভারত! বিদ্বান্ (জ্ঞ) অসক্ত (অনাসক্ত) ভাবে লোকের উশৃঙ্খলতা নিবারণ জন্য সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। কেননা—

"যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরোজনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥"

(গীতা ৩।২১)

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেরূপ আচরণ করেন ইতর (অজ্ঞানী) জনও সেইরূপ আচরণ অনুকরণে কাজ করে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া প্রমাণ সিদ্ধ করেন, সাধারণ লোকে অবিচারিত চিত্তে তাহারই অনুবর্ত্তন করে।

ত্রয়োদশ বল্লী।

—০ঃ*ঃ০—

(কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি।)

আর্য্যগণের বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বহুকাল পরীক্ষিত ও ঋষিগণের দিব্য-দর্শনে বিশোধিত। ধর্ম্মশাস্ত্র প্রবর্ত্তক মনু, যাজ্ঞবল্ক্যাদি দিব্যদ্রষ্টা ছিলেন। এ জন্য ঐ সকল বেদানুগ শাস্ত্রের বিহিত কর্ম্মই কর্ম্ম; তৎ বিরোধী যে কর্ম্ম তাহা বিকর্ম্ম, এবং শাস্ত্র বিহিত কর্ম্মের অকরণ অকর্ম্ম নামে অভিহিত। যতক্ষণ পারমার্থিক সত্তার আবির্ভাব নাই, অর্থাৎ ব্রহ্ম জ্ঞান নাই, ততক্ষণ ব্যবহার সত্তার কর্ম্ম করিতেই হইবে। বিদ্যা ও অবিদ্যা জনিত উভয় প্রকার কর্ম্মই কর্ম্ম। অধিকারী ভেদে ইহা আচরিত হইয়া থাকে। ব্যবহার সত্তায় "আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ"। (গীতা ৭।১৬) এই চারি প্রকারের লোক ঈশ্বরের ভজনা করে। আর্ত্ত—রোগাদি অভিভূত। জিজ্ঞাসু—আত্মজ্ঞানেচ্ছু। অর্থার্থী—ইহলোকে বা পরলোকে ধন ঐশ্বর্য্যাদি জনিত সুখপ্রার্থী। জ্ঞানী —আমিই ব্রহ্ম এবং তদতিরিক্ত কিছুই নাই এইরূপ জ্ঞানযুক্ত। এই চারি শ্রেণীর ভজনাকারী মধ্যে জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ—"তেষাংজ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তি বিশিষ্যতে" (গীতা ৭।১৭) তাহাদের মধ্যে,জ্ঞানী পরব্রহ্মে, একমেবা দ্বিতীয়ে নিত্যকাল অবিচ্ছেদে যুক্ত জন্য শ্রেষ্ঠ। কারণ, ব্রহ্মবেত্তা ব্রহ্ম হইতে চ্যুতি

হয়েন না, চির সংযুক্ত। 'ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্ম এব ভবতি।' এই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মে যে দৃঢ় নিষ্ঠা, তাহাই একাভক্তি বা পরাভক্তি। তথাচ,—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥ (গীতা ১৮।৫৪)

ব্রহ্মভূত অর্থাৎ যিনি ব্রহ্ম হইয়াছেন, সদা ব্রহ্মানন্দে মগ্ন, শোক নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই, সর্ব্বভূতে সম দৃষ্টি। এই অবস্থাই পরাভক্তির অবস্থা। যে অবস্থায় উপাস্য উপাসকে ভেদ থাকে তখন আকাঙ্ক্ষাও থাকে, ভগবৎসান্নিধ্যচ্যুতিভয়ে শোকও থাকে। এজন্য যতক্ষণ ভেদ বুদ্ধি ততক্ষণ পরাভক্তির বা একাভক্তির উদয়ই হয় না। তৎপর তত্ত্ব জ্ঞানে ব্রহ্ম নির্ব্বাণ। "আনন্দং ব্রহ্মনো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন"। ব্রহ্ম আনন্দ-স্বরূপ, তাহাকে লাভ করিলে ভয় থাকে না। এই কথাই গীতার ১৪ অধ্যায়ে ২৬ শ্লোকে পুনঃ কথিত হইয়াছে যথা—"মাঞ্চ যোঽব্যাভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥" যিনি আমাকে অব্যভিচারী ভক্তিযোগে সেবা করেন তিনি সত্ত্ব, রজ, তমাদি গুণের অতীত হইয়া ব্রহ্মভূত বলিয়া কল্পিত হন। কেননা আমি ব্রহ্ম ও আমার স্বরূপ যে ব্রহ্মত্ব তৎপ্রাপ্তিতেই পুনঃ পুনঃ সংসারে গমনাগমন রূপ বন্ধন মুক্ত হয়। নতুবা পুনঃ জন্মমৃত্যুর যে ক্লেশ তাহার শেষ হয় না। গীতায় আছে ক্ষেত্র দেহাদি সবিকারী। প্রতিক্ষেত্রে পরমাত্মাই ক্ষেত্রজ্ঞ। কার্য্যকারণ কর্ত্তৃত্বেহেতু প্রকৃতি। পুরুষ নিরপেক্ষ দ্রষ্টা বা সাক্ষী মাত্র। যত বিকার সব প্রকৃতিগত। প্রকৃতিপুরুষ বিবেক রূপ যে জ্ঞান তাহা আশ্রয় করিলে, ব্রহ্মের যে স্বাধর্ম্ম্য "ব্রহ্মত্ব" "আনন্দত্ব", তাহা প্রাপ্ত হয়। এইরূপ ব্যক্তি সৃষ্টিকালেও আর জন্মেনা, প্রলয়েও ব্যথিত হয় না। ভগবান্ বলিয়াছেন—আমই ব্রহ্ম স্বরূপের

উপলব্ধি করিলে আমাতেই আসিবে অর্থাৎ ব্রহ্মই হইবে। আমাকে প্রাপ্ত হইলে আর দুঃখের আলয় ক্ষণিক্ পুনর্জ্জন্ম নাই। (অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রাপ্তি ব্যতীত অন্য সর্ব্বপ্রকার উপাসনাদি পুনর্জ্জন্মের বাধক হয় না।) পরমা সংসিদ্ধিকে প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতম সংসিদ্ধি 'ব্রহ্মজ্ঞান' হইলে সেই মহাত্মার আর পুনর্জ্জন্ম নাই। আমি ব্রহ্মেই প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ ব্রহ্মই; ইহাই জ্ঞানের সীমা। ধর্ম্ম দ্বারা যে সুখ লোকে আশা করে তাহার চরম ব্রহ্মানন্দ। যাঁহারা অব্যভিচারী প্রেমাভক্তি পথে অগ্রসর হন তাঁহারাও তদ্দ্বারা গুণাতীত হইয়া ব্রহ্ম-স্বরূপ কল্পিত হন। ব্রহ্মভূত হইতে অখণ্ড, অসঙ্গ, ব্রহ্মৈক্য জ্ঞানের প্রয়োজন। তদভাবে দ্বৈতলেশ থাকা পর্য্যন্ত ব্রহ্মভূত হইতে পাবেন না। ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ৮২ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে—যখন কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণজী সহ গোপীগণের বহুকাল পরে সাক্ষাৎ হয়, তখন কৃষ্ণজী তাঁহাদিগকে অখণ্ড পরম ব্রহ্মভাবে কৃষ্ণকে চিন্তনের উপদেশ দিয়াছিলেন। ভগবৎপ্রেমে বিভোবা হইলেও অখণ্ডৈক রস বিষয়ক উপদেশ না থাকায় নরজীবন কৃতকৃত্য হয় নাই। তৎপরে ভগবৎ উপদেশে ও তদবলম্বনে তাঁহারা মুক্তি লাভ করেন। বিশেষতঃ প্রেমা-ভক্তি হইতে শত্রুভাবে ভগবৎ ভজনের শ্রেষ্ঠতা ভাগবতে সপ্তম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। ইহাতে সত্বব তন্ময়তা লাভ হয়। যথা—

বৈরানুবন্ধেন মর্ত্ত্যস্তন্ময়তামিয়াৎ।
ন তথা ভক্তিযোগেন ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ।
∴ গোপ্যঃ কামাদ্ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্‌ বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্ যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো

চৈদ্য—চেদিরাজ শিশুপাল। যূয়ং—যুধিষ্ঠিরাদি। বয়ং—নারদাদি।

গীতাতে কর্ম্ম ও জ্ঞান নিষ্ঠাদ্বয় বলিয়াই কথিত। ভক্তি নিষ্ঠা নয় উহা ঔপচারিক। জ্ঞানে একমেবাদ্বিতীয় ব্রহ্মের অনুভূতি। তখনই যে পরাভক্তি লাভ হয় তাহা দ্বৈতাত্মক প্রেমাভক্তি নহে। এখানে ভক্তি জ্ঞানেরই নামান্তর। ভক্তির পরাকাষ্ঠা জ্ঞান।

"সর্ব্বংকর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।"

(গীতা ৪।৩৩)

ভক্তি কর্ম্মের সহকারী। কর্ম্ম ও জ্ঞান পরস্পর বিরোধী। শ্রুতি বলিতেছেন—"নাস্ত্যকৃতকৃতেন", "নহ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবংতৎ" ইত্যাদি। অর্থাৎ অকৃত বা নিষ্ক্রিয়কে ক্রিয়া দ্বারা পাওয়া যায় না। অবিনাশীকে বিনাশী কর্ম্ম দ্বারা পাওয়া যায় না। কর্ম্ম ত্যাগেই নৈষ্কর্ম্ম সিদ্ধি। শ্রুতি বলেন—"তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথা"—"ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ"। স্মৃতিতেও তাহারই ঝঙ্কার পাওয়া যায়—"নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাভিগচ্ছতি''। অতএব এষণাত্রয় ত্যাগ দ্বারা আত্মার ধর্ম্ম অর্থাৎ আত্মদর্শন বা 'তদ্‌বিষ্ণোপরমপদঃ' প্রাপ্তিরূপ ব্রত পালনীয়। কর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্মোচিত লোক বা পুত্র বা বিত্ত এই এষণাত্রয় দ্বারা নহে। কেবলমাত্র ত্যাগ দ্বারাই অমৃতত্ত্ব লাভ হয়।

"ঈশা বাস্য মিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্‌॥"

যখন ঈশা বা ব্রহ্ম দ্বারা সমস্ত পূর্ণ এবং যেহেতু একই সময়ে একই স্থানে দুই বস্তু থাকিতে পারে না, তখন জগৎ বা ধন কোথায় যে আকাঙ্ক্ষা করিবে? জগৎ বা ধনাদি শশ-বিষান্‌, কূর্ম্ম-রোম, গগনকুসুম, বন্ধ্যা-পুত্রবৎ অলীক। মরীচিকাতে জলান্বেষণবৎ জগৎ বা ধনান্বেষণ পণ্ডশ্রম ও মূর্খতা; সুতরাং ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থ থাকা অসম্ভব। তাই, দীর্ঘ স্বপ্নতুল্য যে জাগ্রদাদি অবস্থা তাহাতে যে প্রপঞ্চ প্রকটিত হয়

তাহা স্বপ্ন জ্ঞানে, ব্রহ্ম বিষয়ে জাগ্রত হওয়া কর্ত্তব্য। শ্রুতি বলিতেছেন 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ্ নিবোধত'। অর্থাৎ সংসাররূপ স্বপ্ন হইতে উঠ, ব্রহ্মবিদ্ বরকে প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্ম বিদ্যা জিজ্ঞাসা কর, ব্রহ্মের অনুধ্যান কর। ব্রহ্মকে জানাই জাগরণ ও তৎবিষয়ে নীরব থাকাই মোহনিদ্রা। গীতাও তাই বলেন—

"যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥"

(গীতা ২।৬৯)

সর্ব্বসাধারণ যে এষনাত্রয়ের বিষয়ে জাগ্রত ও ব্রহ্ম বিষয়ে মোহ-নিদ্রাগত, সংযমী সেই সর্ব্ব বিষয়েই নিদ্রিত ও ব্রহ্মবিষয়ে জাগ্রত হয়েন। এই ব্রহ্ম জ্ঞান বেদান্ত শাস্ত্রের বিবৃত বিষয়। তাই গুরু ও বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাসকেই শ্রদ্ধা বলে। কর্ম্মে মতিগতি বা তৎপরতা শ্রদ্ধা নহে। শ্রুতি বলেন—

"বেদান্তবিজ্ঞান সুনিশ্চিতার্থা সন্ন্যাস যোগাৎ যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ। তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে" অর্থাৎ বেদান্তের অর্থ সুনিশ্চিত জানিয়া এষনাত্রয় ত্যাগে যতিগণ শুদ্ধচিত্ত হন। এই অবস্থায় স্বয়ং প্রকাশ জ্ঞানের প্রকাশ দ্বারা ব্রহ্মভূত হইবার পূর্ব্বে যদি প্রারব্ধবশে দেহ ত্যাগ হয় তথাপি আর অধোগতি হয় না। সেই সব যোগীগণ দেহান্তে ব্রহ্মলোকে প্রবেশ লাভ করেন ও কল্পান্তে ব্রহ্মের নির্ব্বাণের সঙ্গে সঙ্গে নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করেন। তাই বেদান্তই কেবল পরামার্থিক পথের সম্বল। এমন বেদান্তের শিক্ষা পাইয়াও যদি কর্ম্মাদি ত্যাগের জন্য পুরুষকার প্রয়োজিত না হয় তাহার নরজন্ম ধারণ বৃথা। ব্রহ্মজ্ঞানই নরজীবনের কৃতকৃত্যতা। উহাই পরম পুরুষার্থ।

ব্যবহারিক সত্তাতেই জগৎ সংসার। সংসার ত্যাগ কয় জনে করিতে পারে?

"মনুষ্যানাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততিসিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাংবেত্তি তত্ত্বতঃ॥"

সহস্র লোকের মধ্যে একজন সিদ্ধিলাভে যত্নশীল হয়। আবার সিদ্ধিলাভে যত্নশীল হাজারের মধ্যে দুই একজন পরম আত্মাকে জানিতে পারে। তাই সংসারে থাকিয়াও যাহাতে একেবারে পশুধর্ম্মী না হয় তজ্জন্য ঋষিগণ যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাই শাস্ত্রীয় ধর্ম্ম। তাহা সমাজকে সুশৃঙ্খল নিয়ম প্রণালীতে আবদ্ধ রাখিয়া কতকটা শান্তি সুখের বিধান করে ও সর্ব্বোত্তম যে আত্মদর্শন তৎদিকে লইবার জন্য চেষ্টান্বিত করে। এই শাস্ত্র সকল সত্ত্ব, রজ, তম গুণত্রয়ের সমাবেশ দৃষ্টে ও সহজাত কর্ম্মাদি দৃষ্টে বর্ণ ও আশ্রমাদির সৃজন করিয়াছে। ইহা সর্ব্বদেশেই প্রায় তুল্য। যেমন—বিবাহাদির ধর্ম্মাঙ্গতা, ছল চাতুরী ত্যাগে ধনাদি অর্জ্জন ও রক্ষণাদির নিয়ম, অসত্য, চৌর্য্য হিংসাদির নিবারণ, ঈশ্বর উপাসনা, জপ, ধ্যানাদি, সমাজ রাজ্য রক্ষার্থ ব্যক্তি বা সমষ্টির কার্য্যতা। সকল শিক্ষিত দেশেই কতক লোক আছে যাহরা গৃহে থাকিয়া জ্ঞান চর্চ্চা দ্বারা রাষ্ট্র বা সমাজকে উন্নত করে। যেমন—পাদরী, মোল্লা, পুরোহিত, লামা ও ফুঙ্গী ইত্যাদি। কতক লোক (ক্ষত্রিয়াদি) সমাজ রক্ষার্থ যোদ্ধৃকার্য্যে নিযুক্ত থাকে। কতক লোক (বৈশ্য বা বণিক) শিল্প বাণিজ্যাদিতে নিযুক্ত থাকে এবং কতক লোক (শূদ্র) মূঢ় প্রায় পশু জীবন যাপন করে, তাহাদের শ্রমই জীবিকা। দেশ কাল পাত্র ভেদে এই সকল কিছু কিছু বিভিন্ন প্রণালীতে অনুষ্ঠিত হয় মাত্র। যাহারা ধর্ম্ম পথের পথিক তাহারা সর্ব্বত্রই কিছু না কিছু কামিনীকাঞ্চনে বিতৃষ্ণ। ব্রহ্মচর্য্যের মহিমা সর্ব্বত্রই আছে। খৃষ্টান ধর্ম্মের

স্থাপয়িতা যিশু বা তাহার দ্বাদশ শিষ্য কেহই বিবাহ করেন নাই। যিশুর উক্তিতে স্পষ্ট আছে যে কতক লোক সহজ নপুংসক এবং অন্য কতক লোক স্বর্গরাজ্যের জন্য নপুংসক অর্থাৎ ব্রহ্মচারী। পাদরী-গণের অনেকে বিবাহ করেন না, ধর্ম্ম জীবন অতিবাহিত করেন। মুসলমান ফকিরগণও অনেকে বিবাহ করেন না। এক ঈশ্বরই প্রায় সকলের মান্য; তবে সগুণ ও নির্গুণ ভাব নিয়া উপাসনাদির বহিরঙ্গে তর্ক আছে বটে। নির্গুণ উপাসক অপেক্ষা সগুণ উপাসকের সংখ্যা, অর্থাৎ ব্যবহারিক সত্তায় অবস্থিত লোকসংখ্যা অত্যধিক। লোক-হিতার্থ ও শিক্ষার্থ অনেক মহাপুরুষ নির্লিপ্ত ভাবে তাহাদের সংস্রবে আসিয়া থাকেন। প্রাচীন আর্য্যগণের মধ্যে বামদেব, বশিষ্ঠাদি; মাধ্যমিক যুগে উদ্দালক, যাজ্ঞ্যবল্ক, শ্বেতকেতু প্রভৃতি; বর্ত্তমান যুগে চৈতন্য, রামকৃষ্ণ পরমহংসাদি। ইঁহাদের প্রদর্শিত আদর্শ সংসারী জীবন, বর্ণচতুষ্টয় ও আশ্রম চতুষ্টয়ের কার্য্যপ্রণালী সুশৃঙ্খল করার জন্যই বটে। নির্লিপ্ত ও নিষ্কাম ভাবে অনাসক্তচিত্তে কার্য্য করার জন্যই আদর্শ জীবন। ঋষিগণের বাক্যে শ্রদ্ধা করিতে হয়। তাই ঋষিপ্রণীত শাস্ত্র মান্য ও শিরোধার্য্য করা সকলেরই কর্ত্তব্য। ভগবান্ বলিয়াছেন—

"তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্মকর্ত্তুমিহার্হসি॥"

(গীতা ১৬।২৪)

যেমন স্ববর্ণে অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধাদি বৃত্তিতে অর্জ্জুনকে স্থিতিবান করার জন্যই কৃষ্ণজী গীতা কহিয়াছেন; যেমন মনু, যাজ্ঞবল্কাদি স্মৃতিশাস্ত্র সকল প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন; যেমন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, বর্ণ-চতুষ্টয় গুণ কর্ম্মানুসারে সৃষ্ট হইয়াছে, তেমনি প্রতি জীবনে বাল্য

যৌবনাদি ভেদেও কর্ত্তব্যভেদ হয়। তাই ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই আশ্রম চতুষ্টয় স্থাপিত হইয়াছে। বাল্যে পিতামাতা ও গুরুর শাসনে থাকা কর্ত্তব্য; তাই মহাভারতে পিতামাতার বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া তপস্যা করিতে যাওয়ায় ব্রাহ্মণ কুমার যে সফলকাম হন নাই তাহার বর্ণনা ধর্ম্ম-ব্যাধের উপাখ্যানে আছে। স্বধর্ম্মে অর্থাৎ সহজাত ধর্ম্মে নিষ্ঠাবান্ হইলে যে উহা ফলপ্রদ ও মঙ্গলাস্পদ হয় তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত উক্ত উপাখ্যানের ধর্ম্ম-ব্যাধ ও তাহার গৃহস্থ পত্নী। রামায়ণেও গুহক চণ্ডাল ও শবরীর উপাখ্যানে সহজাত ধর্ম্মে স্থিত হইয়া ধর্ম্ম-বিষয়ে উন্নতি লাভের ও ভগবৎকৃপা লাভ করার বিষয় বর্ণিত আছে। উহারা সকলেই দিব্যদর্শনাদির অধিকারী হইয়াছিল।

স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥ (গীতা)

আশ্রম হইতে আশ্রমান্তরে শ্রেণীবদ্ধমত গেলে সকল দিকই সুখের হয়। সংসারে যে শ্রেণীতেই কেন থাকনা, ঈশ্বর উপাসনাদি দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হয় ও শান্তি পাওয়া যায়। অমুকের আছে, আমার নাই, না ভাবিয়া, শান্তিতেই আনন্দ, ভগবান যা দিয়াছেন তাহাই বেশ, এইরূপ বুদ্ধিতে চলিলে শান্তিলাভ হয়। এই আনন্দ ধারা সেই সচ্চিদানন্দ হইতেই সর্ব্বতঃ অনুস্যূত।

চিত্ত নির্ম্মল হইলে, সদ্গুরুর প্রসাদে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হইলেই স্বয়ংপ্রভ জ্ঞান হৃদ্‌কন্দরে প্রকাশমান হয়। যেমন কাপড়ে রঙ্ দিবার পূর্ব্বে কাপড় সাবান দিয়া কাচিতে হয়। সাবান দিয়া কাচায় রঙ্ ফলেনা। রঙ্ লাগান পৃথক্ ব্যাপার। যদিচ চিত্তের নৈর্ম্মল্য সম্পাদন কর্ম্মসাপেক্ষ তথাপি, ব্রহ্মবিদ্যা অনুশীলন বা শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন তর্কচ্ছলে কর্ম্ম হইলেও উহা তূষ্ণীম্ভাব বিধায় অকর্ম্ম সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। উহা নিষ্কর্ম্মই। কর্ম্ম সর্ব্বদাই সফলক হয় এবং ফল নিবন্ধন বন্ধনের হেতু হয়। শ্রবণ, মনন ও

নিদিধ্যাসন তদ্রূপ বন্ধনোপযোগী ফলদায়ক নহে। উহা জ্ঞান বিকাশের দ্বারা যাবতীয় কর্ম্মফলের বিনাশের হেতুভূত। যতক্ষণ কর্ত্তা, কারণ, কার্য্য , ভোক্তা, ভোগ্য, ভোগ ; উপাসক, উপাস্য ও উপাসনা , দ্রষ্টা, দৃশ্য, দর্শন , জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান এইরূপ ভেদ ভাব চিত্তে জাগে, ততক্ষণ সে ব্যক্তি দ্বৈত পল্বলেই ডুবিয়া আছে জানিবে। সংসারে আসিয়া শব্দব্রহ্ম (বেদ) ও কার্য্যব্রহ্ম (ঈশ্বর) চিন্তা ও ভজনা দ্বারা হৃদয় নির্ম্মল হইলে, সদ্‌গুরুর কৃপায় জীব ঈশ্বর ও পরব্রহ্মের ঐক্যতারূপ.. "তত্ত্বমসি" বাক্যের বা "অহং ব্রহ্মাঽস্মি" মহাবাক্যের স্বরূপ উপলব্ধি দ্বারা পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হয়। ইহার নাম জ্ঞান লাভ। ইহারই নাম মুক্তি। ইহাই তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমপদলাভ। ইহাই মানব জন্মের কৃতকৃত্যতা।